বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ম ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ চৈত্র, ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথঠাকুর লেন, কলিকাতা।
মুদ্রাকর শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিঃ, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব

মহাশয়েষু

পরিভাষা-পরিচয়

অতীন্দ্রিয়—Transcendental.
অনুপপত্তি—Fallacy.
অভাব—Negation.
অনৃত—Unreal.
আবির্ভাব—Emergence.
আপতন—Accident.
ইন্দ্রিয়বাদ—Empiricism.
ইন্দ্রিয়োপাত্ত—Sense-datum.
উদ্দেশী—Teleological,
উপসিদ্ধান্ত—Corollary,
কম্বোজ—Mollusc.
চিদচিৎ—Conscious and unconscious.
দ্বন্দ্ব—Contradiction.
ধারণা—Idea.
নন্দনতত্ত্ব—Aesthetics.
নিগমন—Conclusion.
পরমাণু—Atom.
পরিণাম—Repetition.
পরম—Ultimate.
প্রতিবিম্ববাদ—Representationism.
প্রতিরূপ—Image.
প্রতিজ্ঞা—Premise.
প্রতিভাস—Appearance.
প্রতীক—Symbol.
প্রত্যয়—Concept.
বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ—Realism.
বিশেষ—Particular.
বিজ্ঞানবাদ—Idealism.
বুদ্ধিবাদ—Rationalism.
বৈচারিক—Critical.
ব্রহ্মবাদ—Absolutism.
মেরুদণ্ডী—Vertebrate.
যাদু—Magc.
যান্ত্রিক—Mechanical.
সম্বন্ধ—Relation.
সংজ্ঞা—Definition.
স্বজ্ঞা—Intuition.
সংবেদন—Sensation.
সামান্য—Universal.
সংশ্লেষণ—Synthesis.
সৃজনী—Creative.
স্বতন্ত্র—Individual বা Distinct.
সিদ্ধান্ত—Proposition.

পটভূমি

অরুন্ধতী নক্ষত্রকে আকাশের অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া কঠিন; তার যে-জ্যোতি পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয় সে-জ্যোতি বড় সূক্ষ্ম, বড় ক্ষীণ। অথচ, আমাদের দেশে প্রথা ছিল বিবাহরাত্রে নববধূকে সেই নক্ষত্র দেখানো। এই দুরূহ কাজ সহজে সেরে নেবার জন্যে প্রাচীনেরা এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। অরুন্ধতীর কাছাকাছি আকাশে যে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র চোখে পড়ে তার দিকে নববধূর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথমে বলা হত: ওই দেখ অরুন্ধতী! দৃষ্টি একবার সেখানে নিবদ্ধ হলে ক্রমশ তাকে সরিয়ে পাশের সূক্ষ্ম আর ক্ষুদ্র অরুন্ধতীর উপর নিয়ে যাওয়া কঠিন হত না। লোকব্যবহারের এই উপমা দিয়ে প্রাচীনেরা দর্শনশাস্ত্রেও একটি পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, সে-পদ্ধতির নাম তাই অরুন্ধতী-ন্যায়। বক্তব্য যেখানে বেশি জটিল, বেশি সূক্ষ্ম, সেখানে প্রথমেই পাঠককে তার মধ্যে টেনে আনতে গেলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা—অপেক্ষাকৃত স্থূল কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করে ক্রমশ সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়।

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ-পাঠ্য, অতএব সহজবোধ্য, পুস্তিকা রচনায় প্রয়াসী হয়ে প্রাচীনদের উক্ত পদ্ধতিকে অমূল্য উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছি। হালের বিদেশী দর্শনে কূটতর্ক ও অতি সূক্ষ্ম প্রসঙ্গের এমন প্রাচুর্য যে সে-সবের অক্ষম উল্লেখ করেও সাধারণ পাঠককে বিপর্যস্ত করে ফেলা যায়। তাতে নিশ্চয়ই মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অপরপক্ষে, এ-যুগের দর্শনের নিছক বহিঃরেখার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

পারলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। কেবল বলে রাখা দরকার—এ নেহাতই স্থূল, বাহ্য পরিচয়—আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে এর পর যোগ্যতর ব্যক্তির নির্দেশ মেনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে।

আপাতত, নেহাৎ স্থূল পরিচয়ের উদ্দেশ্য বলেই 'আধুনিক' বা 'দর্শন' কথার শব্দার্থ নিয়ে তর্ক সংগত হলেও উপেক্ষা করা প্রয়োজন। উভয় শব্দকেই প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা ভালো। এক কথায়, আজকাল বিলেতে পাঁচজনে যে-সব মতবাদকে দার্শনিক মতবাদ বলে স্বীকার করে নেন তারই সামান্ত পরিচয় এ পুস্তিকার একমাত্র আদর্শ।

হালের য়ুরোপীয় দর্শনের একদিকে ব্রাডলি প্রমুখের পরব্রহ্মবাদ, এবং অপরদিকে নানান ভাবে, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সর্বগ্রাসী ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ, তীব্র বিদ্রোহ। কিন্তু আলোচনা সুরু করতে হবে আরও গোড়ার কথা থেকে। কেননা, সাম্প্রতিক ব্রহ্মবাদে হেগেল-দর্শনের প্রতিধ্বনি; এবং মধ্যযুগের পর থেকে য়ুরোপীয় দর্শনে যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল তারই চরম বিকাশ দেখা গেল হেগেলে। তাই, পটভূমি হিসেবে, সে-যুগের কথাটুকু বলে নেওয়া দরকার।

মধ্যযুগের দার্শনিকদল প্রধানত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। বিশ্বের চরম রহস্য যে ধর্মপুঁথির পাতায় আবদ্ধ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা ছিল নেহাতই নাস্তিক নির্বুদ্ধিতা; দর্শনের আসল কাজ তাই তথ্য আহরণ নয়, অর্থ বিশ্লেষণ—ধর্মের গূঢ় রহস্য মানববুদ্ধির আওতায় এনে দেওয়া। এ-যুগের দর্শন তাই বন্ধ্যা আধ্যাত্মিকতা এবং শব্দার্থ প্রভৃতি নিয়ে কূট বিচারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখন কোনো মহৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্ম যে হয়নি তা নয়, কিন্তু তাঁরাও ছিলেন যুগের দাস। সমাজতন্ত্রের

পণ্ডিত তাই বলেন দর্শনের এ দুর্গতি সামাজিক দুর্গতিরই প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগে সমাজের দেহে প্রাণশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল এবং সেই, টমাস এ্যাকুইনাসের মত প্রখর মেধাবীকেও এই অথর্ব সমাজেরই দাসত্ব মানতে হয়েছিল।

তারপর য়ুরোপে ধন উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিল আর এই আলোড়নের ঢেউ এসে লাগল শিল্প ও সংস্কৃতির তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক রাজত্বেও। দার্শনিকের দল নতুন উৎসাহে কাজ সুরু করলেন, মধ্যযুগের বৃথা তর্কে তাঁদের আর মন উঠল না। অধ্যাত্মবিদ্যার ঘোলাজলে কূপমণ্ডুকের মত বসে থাকা নয়—নতুন পথে এগোতে হবে। কিন্তু কোন্ পথ? তখন তাঁদের সামনে পথ শুধু একটাই: যে পথে বিজ্ঞান এগোয়। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন অভিযান সকলের চোখে নেশা ধরিয়েছে, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার দুনিয়ার চেহারা একেবারে বদলে দিতে চাইছে। অবশ্যই, এ পথ দুর্গম,—পুরোনো পৃথিবীর যারা প্রতিনিধি তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, মরিয়ার মত যে-কোনো উপায় অবলম্বন করে এই অগ্রগতি রুখতে বদ্ধপরিকর। তবু, অনেক সংগ্রামের পর, অনেক আত্মোৎসর্গের পর—রোজার বেকন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, কেপলার, ব্রুনো প্রভৃতির বিরাট ব্যক্তিত্বের সাহায্যে,—শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানেরই জয় হল এবং দার্শনিকের দল প্রায় অবিসংবাদিত ভাবেই স্বীকার করলেন বিজ্ঞানের পদ্ধতি আর দর্শনের পদ্ধতি অভিন্ন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি দার্শনিক মহলে শোনা গেল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত আগমনী। উদাহরণ, ইংলণ্ডে ফ্রান্সিস্ বেকন আর ফ্রান্সে রেনে ডেকার্ট। কিন্তু বিপদ বাধল বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ নির্ণয় নিয়ে। এই সমস্যার মুখোমুখি এসে দার্শনিকদল স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত হয়ে

পড়লেন। ডেকার্ট, স্পিনোজা আর লাইবনিৎস্ ঠিক করলেন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ গণিতশাস্ত্রে এবং গণিতশাস্ত্রের সাফল্যের মূল রহস্য শুদ্ধবুদ্ধি-নির্ভরতা। অতএব, বিশুদ্ধ বুদ্ধিই দার্শনিকের অস্ত্র হওয়া উচিত। অপরপক্ষে, বেকনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লক্, বার্কলি এবং হিউম প্রচার করলেন যে পদার্থবিজ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান এবং এখানে জ্ঞান যে বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে তার একমাত্র কারণ অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়সংবেদ-এর উপর একান্ত নির্ভরতা।

কিন্তু মজার কথা এই যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত পদ্ধতি নিয়ে এঁদের মধ্যে যত কলহই থাকুক-না কেন, বিশ্বের স্বরূপ বর্ণনায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল। কেননা, এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে যে-মত সত্যিই প্রাধান্য পেয়েছে তা হল বিজ্ঞানবাদ,—যদিও এ বিজ্ঞানবাদ সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয়, কোথাও বা তা ব্যক্ত কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। বিজ্ঞানবাদের মূল কথা—বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব সত্তা বলতে কোনো কিছু নেই, তার অস্তিত্ব আসলে নির্ভর করে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর। একদিকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অমন অগাধ উৎসাহ এবং অপর দিকে বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব সত্তা অস্বীকার করাটা মজার ব্যাপার নয় কি? কারণ, অন্তত সহজবুদ্ধিতে যা মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে জ্ঞান, গবেষণা বা আবিষ্কারে উৎসাহী হওয়া সম্ভবই নয়। তবুও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েই, বিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মনগড়া মতবাদ প্রচার করে, এ যুগের দার্শনিকদল একটানা এগিয়ে চললেন বিজ্ঞানবাদের দিকেই! এবং যাঁরা এই বিজ্ঞানবাদে সায় দেননি, যাঁরা জড়বাদের জয়ধ্বনি তুলতে চেয়েছিলেন (যেমন বিশেষ করে ফরাসী জড়বাদীদের কথা বলা যায়) পেশাদার দার্শনিক মহলে তাঁদের যেন আমলই দেওয়া হল না। অবশ্যই, সমাজতত্ত্বের পণ্ডিত মনে করিয়ে দেন যে, এ যুগের দর্শনে এমনটা না

হয়ে উপায় ছিল না। কারণ, য়ুরোপের নতুন সমাজে—ধনতান্ত্রিক সমাজে—শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ল। একদিকে শ্রম-মজুরের দল—তারা শুধুই গতর খাটায় এবং শুধু গতর খাটায় বলেই মাথা খাটাবার ফুরসত পায় না। অপরদিকে বিজয়ী মধ্যবিত্তর দল। তাদের হাতে পুঁজি জমল অজস্র এবং তারা দেখলে পুঁজি খাটিয়েই পুরুষার্থ লাভ হয়, গতর খাটাবার প্রয়োজন নেই, মাথা খাটাবার ঢালাও অবসর। নবযুগের দার্শনিকরা এই নব্য শ্রেণীরই প্রতিনিধি—চিন্তার আর জ্ঞানের জয়ধ্বনি না তুলে তারা পারবে কেন? বিজয়োদ্ধত নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণী কারো কোনোরকম দাসত্ব মানতে রাজি নয়—এমন কি জ্ঞানের বেলাতেও বিষয়ের হুকুম, বিষয়ের দাসত্ব স্বীকার করা অসম্ভব। তাছাড়া, এই চিন্তা বা জ্ঞান জিনিসটার মধ্যেই যে তার একান্ত নিজস্ব স্বাক্ষর। তাই দার্শনিকের দলও প্রচার করলেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি জ্ঞাতার মনের মুখাপেক্ষী। এর কোনো নিজস্ব সত্তাই নেই—জ্ঞাতার উপর হুকুম জারি করা তো দূরের কথা। এদিকে বিজ্ঞানের কথাটাও অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়; কেননা বিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে পেয়েছিল বলেই নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। আর, বিজ্ঞানকে মেনে নিয়ে, এমন কি বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েও, বিজ্ঞানবাদ মানতে বাধা নেই। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে মনগড়া জিনিস বলে প্রচার করবার সাহস ও তর্কবল যাদের আছে তাদের পক্ষে বিজ্ঞানের একটা মনগড়া ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়।

অবশ্য আগেই বলেছি, এ যুগের সমস্ত দার্শনিকদের বিজ্ঞানবাদ সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয়। কাণ্টের পর থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু কাণ্টের আগে পর্যন্ত বুদ্ধিবাদী এবং ইন্দ্রিয়বাদী দুই দার্শনিক সম্প্রদায় কেমন ভাবে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদী

তা আলোচনা করতে হবে। বুদ্ধিবাদ দিয়ে শুরু করা যাক।

ডেকার্ট দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন চরম নিশ্চয়তার উপর। এ নিশ্চয়তা কোথায় পাওয়া যাবে? বিশ্বের বস্তুরাজ্যে নয়, কেননা স্বপ্নে তার সত্তা অবিকৃত থাকে না। এমন কি গণিতের রাজ্যেও নয়, কেননা গণিতে বুদ্ধির বিশুদ্ধ ক্রিয়া হলেও এমন তো হতেই পারে যে এক দুষ্ট স্রষ্টার কূট ইচ্ছায় আমাদের বুদ্ধি-ব্যাপারটার মূলেই গলদ রয়ে গিয়েছে। তাহলে? সংশয়ের সীমা সম্পূর্ণ পেরিয়ে কি কিছু খুঁজে পাওয়া যায়? উত্তরে ডেকার্ট বললেন, একমাত্র আমাদের মন, আমাদের চিন্তাশক্তি, সবরকম সংশয়ের সীমা পেরিয়ে রয়েছে। কেননা, সংশয় ব্যাপারটাই চিন্তার ক্রিয়া এবং স্রষ্টা যদিই বা প্রতি পদে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিভ্রান্ত করতেই উৎসুক হন তাহলেও, অন্ততঃ বিভ্রান্ত হবার জন্যেও, এই বুদ্ধিবৃত্তির সত্তা অবশ্যম্ভাবী। তাই, দুনিয়ার সব কিছু সম্বন্ধে সংশয় করা যেতে পারে, পারে না শুধু জ্ঞাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে। কাণ্ট তাই ডেকার্ট-দর্শনকে সংশয়াত্মক বিজ্ঞানবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। স্পিনোজা এলেন ডেকার্টের পর; বললেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই ব্রহ্মের, এই অবিকারী সনাতন সত্তার স্বরূপ কি? উত্তর পাওয়া যায় স্পিনোজার গ্রন্থের শেষাংশে—ব্রহ্মজ্ঞান, যার নাম তিনি দিয়েছেন প্রেমগত জ্ঞান, তার মধ্যেই ব্রহ্মের বিকাশ; বেদান্তে যেমন বলা হয়—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম। এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদ বলে স্বীকার না করে আর উপায় কি? স্পিনোজার পর লাইবনিৎস্। লাইবনিৎসের বিজ্ঞানবাদ স্পষ্ট ও ব্যক্ত। জ্ঞাতার প্রত্যক্ষ তাঁর কাছে প্রত্যক্ষাভাস মাত্র, কেননা জগৎ আর কিছুই নয়, অসংখ্য চিৎপরমাণুর লীলা। যাকে আজ জড় বলে মনে হচ্ছে আসলে তা হল অচেতন মন—

ক্রমোন্নতির পথে একদিন তার মধ্যেও চেতনার সাড়া পাওয়া যাবে।

এই তো গেল যুক্তিবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা। অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়বাদও ক্রমশঃ একটানা এগিয়ে চলল বিজ্ঞানবাদের পথে। লক্ অবশ্যই সচেতনভাবে বিজ্ঞানবাদী ছিলেন না। কিন্তু লকের দার্শনিক বংশধর বার্কলি ও হিউম স্পষ্টই দেখতে পেলেন দর্শনে লক্ যে বীজ বপন করেছেন তার একমাত্র ফল হল বিজ্ঞানবাদ। অর্থাৎ, লকের মূলসূত্র যদি মানতেই হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদ ছাড়া আর কোনো গতি নেই। লকের প্রধান কথা ইন্দ্রিয়-সংবেদনই জ্ঞানের একমাত্র উৎস, এবং এ বেদনা যার সংবাদ দেয় শুধু তার সত্তাই অবিসংবাদিত অথচ, নিছক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগৎ বলে কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভবই নয়। ইন্দ্রিয় মানবমনের কাছে যে সংবাদ আনে তা শুধু কয়েকটি ইন্দ্রিয়-সংবেদনেরই এবং সেই বেদনাগুলি মানসিক জিনিস, বহির্জগতের জিনিস মোটেই নয়। পাঠ্যপুস্তকের অতি-প্রচলিত উদাহরণটাই ধরা যাক: নিছক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে টেবিল বলে কোনো জিনিসের সন্ধান কি মানুষ কখনো পেয়েছে? যা পাওয়া যায় তা তো শুধু কয়েকটি ধারণা—চোখ দিয়ে রঙের আর আকৃতির ধারণা, হয়তো বাদামী রঙের ধারণা, চৌকো আকৃতির ধারণা; স্পর্শ দিয়ে কাঠিন্যের ধারণা, মসৃণতার ধারণা—এই রকম শুধু কয়েকটি ধারণাই। এবং ধারণা মাত্রই মানসিক। হয়তো অভ্যাস বশতঃ এই সব ধারণার সমষ্টিকেই আমরা টেবিল বলে উল্লেখ করি; কিন্তু এই বস্তু-টেবিল-কে কোনোদিন চোখেও দেখি নি, হাত দিয়েও স্পর্শ করি নি। অতএব, নিছক ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হলে টেবিল বলে বস্তুর কথাই তোলা উচিত নয়—অজস্র মানসিক ধারণা এবং তাদের সমষ্টি ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। এ হল চরম

বিজ্ঞানবাদের কথা, এবং হিউম পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে ইন্দ্রিয়বাদের এই হল একমাত্র পরিণতি।

তারপর এলেন কাণ্ট। তিনি দেখলেন মধ্যযুগের পর দর্শনের ক্ষেত্রে কোলাহল যতই হোক না কেন, কাজ একটুও এগোয় নি। দর্শন ঘোলাজলের ডোবাই হয়ে রয়েছে; না এসেছে নিশ্চয়তা, না দেখা দিয়েছে অগ্রগতি। তার কারণ বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ যে কী তা বুদ্ধিবাদও ধরতে পারেনি, ইন্দ্রিয়বাদও নয়। এই দুই মতবাদই ভ্রান্ত কেননা উভয়েই অর্ধসত্যকে পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। পদার্থবিজ্ঞান আর বিশুদ্ধ গণিত—দুইই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হিসেবে এদের মূল রহস্য একই। বিজ্ঞানের প্রকৃত প্রণালী—অতএব জ্ঞানের মূল উৎস—নিছক বুদ্ধিও নয়, নিছক ইন্দ্রিয়সংবেদনও নয়, এ দুয়ের সার্থক সংশ্লেষণ। কথাটা কাণ্ট কি ভাবে প্রমাণ করেছেন সে আলোচনার অবসর এখানে নেই, মোটামুটি তাঁর মতবাদটুকু বলা যায়। তাঁর মতে মানব-মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে সংবেদন সংগ্রহ করে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের উপর 'দেশ' আর 'কাল' বলে দু রকমের মানসিক ঠুলি পরানো আছে; তাই যে সংবেদনই মনের কাছে পৌঁছোক না কেন তার উপর দেশ ও কালের ছোপ পড়ে যায়। অবশ্যই, এই দেশ ও কালের মধ্যে দিয়ে যে সংবেদন সংগ্রহ করা হয় সেটাই জ্ঞান নয়, জ্ঞানের মালমশলা মাত্র। শুধু মালমশলা স্তূপ করে রাখলেই তো ইমারত তৈরি হয় না—রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে তা দিয়ে কাজ করাতে হয়। জ্ঞানের বেলাতেও ঠিক তাই: ইন্দ্রিয় বেদনগুলোর উপর বুদ্ধির ক্রিয়া হলে তবেই গড়ে ওঠে জ্ঞানের ইমারত। বিশ্বজগৎ বলতে আমরা এই ইমারতকেই বুঝি। তাহলে, আমরা যা-কিছু জানি তার অনেকখানিই আমাদের মনের সৃষ্টি—জ্ঞাতার বুদ্ধির দান বাদ দিলে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ কি রকম হত তা জানবার কোনো উপায়ই

আমাদের নেই। যে জগৎকে আমরা জানি তা প্রধানতই বুদ্ধি-নির্মিত। সে জগৎকে পেরিয়ে বস্তুর আসল রূপ আবিষ্কার করবার উপায় না থাকলেও দার্শনিকদের মধ্যে তার আগ্রহ অপরিসীম, এবং এই অপরিসীম আগ্রহের বশবর্তী হয়ে বস্তুসত্তা সম্বন্ধে তাঁরা নানা রকম এলোমেলো মতবাদ প্রচার করেন মাত্র। সে যাই হোক, বিশ্বপ্রকৃতিকে বুদ্ধিনির্মাণ বলাই যখন বিজ্ঞানবাদের মূল কথা, তখন কান্টকেও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবাদী বলতে হবে।

কান্টোত্তর দার্শনিকদের প্রধান উদ্দেশ্য হল কান্টের বিজ্ঞানবাদকে আরও একটু মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। কান্টের দর্শনে দ্বৈতবাদের অসহ্য প্রতিপত্তি: একদিকে মানবমন এবং অপরদিকে চিরঅজ্ঞাত বস্তুসত্তা। এ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দূরের কথা, মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত নেই! ফিক্‌টে, শেলিং আর হেগেল এই দ্বৈতবাদের হাত থেকে মুক্তি খুঁজলেন, বিজ্ঞানবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন অদ্বৈতবাদের মজবুত ভিত্তির উপর। ফিক্‌টে বললেন, কান্টের তথাকথিত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুস্বরূপ অলীক ধারণা মাত্র। যাকে জানা যায় না, জানবার কোনো উপায়ই নেই, তাকে মানাই বা যাবে কেমন করে? তাহলে, মানুষের মন আর সেই মনের নির্মাণ—এ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু, মন যে নির্মাণ করে সে নির্মাণের মালমশলা জোটে কোথা থেকে? ফিক্‌টে বললেন, তথাকথিত কোনো বস্তুস্বরূপ থেকে নিশ্চয় নয়, কেননা সে জিনিস অলীক। তাহলে? মানতেই হবে যে, মানবমন নিজেই জ্ঞানের মালমশলা তৈরি করে, আর তার পর তাকে জানে। এ যেন তার একরকমের লীলা—মন নিজেই নিজের চারপাশে গণ্ডি টানছে!

শেলিং কিন্তু ফিক্‌টের কথায় সায় দিতে পারলেন না: আমাদের মন, আমাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিগত মন, একমাত্র সত্য হতে পারে না।

পরমসত্তা হল ব্রহ্ম-মন, এবং এ ব্রহ্মের এমন বর্ণনা তিনি দিলেন যে শেষ পর্যন্ত যেন তিনি স্পিনোজার ব্রহ্মবাদেই ফিরে যেতে চান। তারপর হেগেল। ফিক্‌টের মতো আমাদের ব্যক্তিগত মন বা চিন্তা-ধারাকেই একমাত্র সত্তা বলে মেনে নিতে তিনি রাজি নন, অপরপক্ষে স্পিনোজা বা শেলিং-এর সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যাতেও তাঁর উৎসাহ নেই। অথচ, কান্টীয় অজ্ঞানবাদ একেবারেই অসহ্য। ফলে, হেগেল শুরু করলেন সগুণ ব্রহ্মের কথা। পরমসত্তা ব্রহ্ম-মন সন্দেহ নেই; কিন্তু এ ব্রহ্মের মধ্যে চিদচিদ জগতের স্থান অবিসংবাদিত। বস্তুত, এই চিদচিদ্‌ জগতের মধ্যে দিয়েই তাঁর বিকাশ। নিজের চারপাশে স্বেচ্ছা-গণ্ডী রচনা করা তাঁর লীলা নয়—তাঁর লীলা হল সীমার মধ্যে অসীম সত্তাকে প্রকাশ করা। হেগেলের দার্শনিক প্রতিভার সঙ্গে মিশেছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, এবং এই পাণ্ডিত্যের বলে জ্ঞানের প্রত্যেক অঙ্গ বিচার করে তিনি দেখালেন কেমন করে পরব্রহ্ম ইতিহাসের প্রত্যেকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছেন। হেগেলের ব্রহ্মবাদ তাই সর্বগ্রাসী ব্রহ্মবাদ।

ব্রহ্মবাদ ও আধুনিক ইংলণ্ড

ইংলণ্ডে, ব্রাডলি বললেন, আমরা বহুদিন আচ্ছন্ন ছিলাম ইন্দ্রিয়-বাদের ঘোরে। এ ঘোর কাটিয়ে ওঠাতেই আধুনিক ব্রহ্মবাদের মূল উৎসাহ, এবং বহুদিনের তন্দ্রা ভাঙাবার জন্যে যে কড়া দাওয়াইয়ের দরকার তার আমদানি হল খোদ জার্মানি থেকে : কাণ্ট-হেগেলের যুক্তিকণ্টকিত দর্শন।

হিউমের পর ইংরেজ দার্শনিকেরা বহুদিন পর্যন্ত বিদেশী ভাবধারা সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে স্বস্তি খুঁজেছিলেন খাঁটি স্বদেশী ঐতিহ্যে। তাই অনেকদিন একটানা ইন্দ্রিয়বাদের জের চলল। এ সময়ে সত্যি নাম করবার মত দার্শনিক অন্তত দুজন জন্মেছিলেন,—জন স্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সার। মিল তো সোজাসুজি হিউমেরই দার্শনিক বংশধর এবং স্পেন্সার ডারউইনের আবিষ্কারের নেশায় একেবারে বুঁদ হলেও ইন্দ্রিয়বাদের আকর্ষণ মোটেই ছাড়তে পারেন নি। ইতিমধ্যে, ধার্মিক মহলে অবশ্যই দুচার রকম সাধুবাক্য শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এতদিনে ব্যস্তসমস্ত ইংলণ্ডের শিক্ষিত-সাধারণ নেহাত ছুটির রবিবার ছাড়া পাদ্রীদের বুলিতে মোটামুটি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। ফলে, হিউমের পর ইংলণ্ডে অনেকদিন ইন্দ্রিয়বাদের একচেটে রাজত্বই চলল।

এই একটানা ইন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে প্রথম জোরালো আপত্তি শুনতে পাওয়া গেল সাহিত্যিক সমাজে : কোলরিজ, কার্লাইল,—এঁরা জাতে সাহিত্যিক হলেও দর্শনে সকলের প্রচুর উৎসাহ এবং সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে দিকপাল হলেও জার্মান-দর্শনের দিকেই তাঁদের প্রধান

ঝোঁক,—কাণ্ট, ফিকটে, শেলিং এবং বিশেষ করে হেগেলের প্রতি এঁদের সকলেরই অনুরাগ আর শ্রদ্ধা গভীর। তবুও, এরা সাহিত্যিক এবং জাত-সাহিত্যিক। তাই দর্শন যতটা এসেছে ততটা সাহিত্যের মুখোস পরেই এসেছে এবং সাহিত্যের মুখোস পরে এসেছে বলেই এঁদের সাম্প্রতিক ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলতে সংস্কারে বাধে।

ইংলণ্ডে ইন্দ্রিয়বাদের ঐতিহ্য ভেঙে, পেশাদার দার্শনিক মহলে ব্রহ্মবাদের প্রথম প্রচার সুরু করলেন স্টারলিং। তারপর গ্রীন, কেয়ার্ড ব্রাডলি, বোসাঙ্কে প্রভৃতি এই ব্রহ্মবাদেরই জের টেনে, এই ব্রহ্মবাদকে অনেক দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেদিক থেকে মানতেই হবে যে, স্টারলিঙের গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই ইংরেজী দর্শনের মোড় ঘুরল ইন্দ্রিয়বাদ ছেড়ে জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে। দর্শনের ইতিহাসে বিপ্লব আনতে হলে যে গুণের একান্ত প্রয়োজন, স্টারলিঙের গ্রন্থে তা সমস্তই বর্তমান: পাণ্ডিত্যের গুরুভার নয়, আবেগের বন্যা; সূক্ষ্ম তর্কজাল নয়, উচ্ছ্বাস! গ্রীক দর্শনের যেমন চূড়ান্ত পরিণতি অ্যারিস্টটলে, স্টারলিং বললেন, আধুনিক দর্শনের ঠিক তেমনি হেগেলে। দর্শনের ইতিহাস হেগেলেই সমাপ্ত।

তারপর গ্রীন। গ্রীন কিন্তু হেগেল সম্বন্ধে ভক্তি ও উচ্ছ্বাসকে একমাত্র সম্বল মনে করেন নি। তিনি বরং কাজ সুরু করতে চাইলেন একেবারে গোড়া থেকে, তাই প্রথমটায় ভালো করে ভিত গেঁথে নিয়ে। আর এই পাকা করে ভিত গেঁথে হেগেলকে প্রতিষ্ঠা করার পথে প্রধান বিঘ্ন তিনি দেখলেন ইংরেজি ইন্দ্রিয়বাদ। এ ইন্দ্রিয়বাদ সমূলে নষ্ট করতে না পারলে জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতিষ্ঠা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই প্রথম দরকার সংস্কারের—এ কাজ অবশ্য কাণ্ট আগেই করে গিয়েছেন, প্রয়োজন শুধু জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে তার আমদানি করা। গ্রীনের ইন্দ্রিয়বাদ-খণ্ডনে তাই কাণ্টের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট: ইন্দ্রিয়বাদ-

শুধু বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সংবেদনের স্তূপ খুঁজে পায়, একে জ্ঞান বলে ভুল করলে চলবে না। এই স্তূপ জ্ঞানে পরিণত হতে পারে একমাত্র আত্মার সংশ্লেষণী বৃত্তিতে। কথাটা কাণ্টের কথাই, তবে প্রমাণের ভঙ্গীতে অভিনবত্ব নিশ্চয়ই আছে। সংশ্লেষণ না হলে জ্ঞান যে হতে পারে না তার প্রমাণ গ্রীন নতুন করে দিলেন। অল্প কথায় যুক্তিটা এই : প্রমা আর ভ্রমের প্রভেদ ঠিক কোথায়? সম্বন্ধ-কল্পনা যেখানে যথার্থ সেখানেই প্রমা, আর যেখানে অযথার্থ সেখানেই ভ্রম। মন্দালোকে সামনের দীর্ঘ রজ্জুকে সর্প মনে করা ভ্রম; কারণ সম্মুখের বস্তুর সঙ্গে সর্পের সম্বন্ধ নেই। তাকে রজ্জু মনে করাই প্রমা, কেননা তার সঙ্গে বাস্তবিক রজ্জুরই সম্বন্ধ। তাহলে, সম্বন্ধ বলে জিনিসটাকেই চরম সত্য বলে মানতে হবে। সম্বন্ধকে ঠিক জানাই জ্ঞান, সম্বন্ধকে ভুল জানাই অজ্ঞান। কাণ্ট এ পর্যন্ত ঠিকই বুঝেছিলেন, কিন্তু এর যে-সব দার্শনিক উপসিদ্ধান্ত আছে সেগুলি তিনি ভেবে দেখেন নি। তার সন্ধান পাওয়া যাবে হেগেলে। এ কথা বিচিত্র কিছু নয়, স্টারলিং তো আগেই বলে গিয়েছেন, যে একমাত্র হেগেলই কাণ্টকে বুঝতে পেরেছিলেন। কি সেই উপসিদ্ধান্ত? গ্রীন দেখাতে চাইলেন যে উপরোক্ত মতবাদ থেকে ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত না হয়ে পারে না। পরমসত্তা তো সম্বন্ধের ঠাসবুনোনি। কিন্তু সম্বন্ধ জিনিসটা আসলে কি? ভেদাভেদ, বহুর মধ্যে একের সংগতি। ভেদাভেদের একমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় আত্মার ক্ষেত্রে, বহু মানসিক অবস্থার মধ্যে এক আত্মার বিদ্যমানতায়। তাহলে মানতেই হবে যে পরমসত্তা আত্মিক। কোনো ব্যক্তিগত মানুষের বিশেষ আত্মা? গ্রীন বললেন, তা নয়। ব্রহ্ম বা পরম আত্মা। প্রত্যেক মানুষ তার আভাস পায়, কারণ প্রত্যেকের সংকীর্ণ আত্মার মধ্যে তার প্রকাশ। এইভাবে কাণ্টকে অনুসরণ করে গ্রীন ইন্দ্রিয়বাদ খণ্ডন করলেন,

এবং শেষ পর্যন্ত কান্টকে পেরিয়ে গিয়ে হেগেলে স্থিতি পেলেন।

তারপর কেয়ার্ড। তিনি হেগেলের ভক্ত, হেগেল-দর্শনেরই প্রতিনিধি। তবু তাঁর বইগুলির মধ্যে দুহাজার পাতার বেশি কান্টের টীকা; হেগেল সম্বন্ধে শুধু ছোট একটা বই। কারণ কেয়ার্ড সরাসরি হেগেল থেকে সুরু করায় আস্থাবান ছিলেন না: কান্ট থেকে হেগেলে গিয়ে পৌছোনোতেই তাঁর আস্থা। তাই কান্ট সম্বন্ধে তাঁর টীকার আগাগোড়াই হেগেলের দৃষ্টিকোণ থেকে কান্টের সমালোচনা। কান্ট তো নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, সংশ্লেষণই জ্ঞানের মূলসূত্র। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর মতে একদিকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুসত্তা এবং অপরদিকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানরাজ্য—এ দুয়ের ভিতর বিভেদ থাকায় দার্শনিক চিন্তাধারার চরিতার্থতা হয় নি। আসলে কান্ট যেন নিজেকেই ঠিকমত বুঝতেন না, নিজের মতবাদের প্রকৃত মর্ম তিনি খুঁজে পাননি। সে মর্ম পাওয়া যায় হেগেলে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—এ জগৎ যাঁর বিকাশ, ব্যষ্টিমনে যাঁর প্রকাশ, পরমসত্তা তা ছাড়া আর কিছুই নয়!

তারপর ব্রাডলি। গ্রীন বা কেয়ার্ডের মত কান্ট-হেগেলের টীকা ব্রাডলি করেন নি। দার্শনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি গ্রন্থরচনা করেছেন। তবু তাঁর দর্শনে কান্ট-হেগেলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বিশ্বকে বুদ্ধি যে ভাবে চেনে তা প্রতিভাস মাত্র, তাতে সত্তার সন্ধান নেই। এ কথা ব্রাডলি প্রমাণ করতে চান যে-সব কাঠামো দিয়ে দুনিয়াকে আমরা বুঝি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে। সে বিশ্লেষণে ধরা পড়ে দেশ, কাল, কার্য, কারণ, দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ ইত্যাদি বিশ্বের প্রধান প্রধান পদার্থগুলির মধ্যে বিরুদ্ধধারণার জঞ্জাল, এবং যেখানে বিরুদ্ধধারণা বর্তমান, সত্য সেখানে টিঁকতে নিশ্চয়ই পারে না

এর কারণ কি? উত্তরে ব্রাডলি বলেন, বুদ্ধি জিনিসটার গোড়ায় গলদ রয়ে গিয়েছে। কারণ বুদ্ধির সবচেয়ে সরল উদাহরণেও বিরুদ্ধধারণার দ্বন্দ্ব। বুদ্ধির একটি সরল সিদ্ধান্ত ধরা যাক: "এটা হল ঘোড়া"—"এটা" ও "ঘোড়া" যদি পৃথক জিনিষ না হয় তা হলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অনর্থক, এবং "এটা" ও "ঘোড়া" যদি পৃথক জিনিষ হয় তা হলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। তাঁর মতে দ্বিতীয় কথাই ঠিক। সিদ্ধান্তের দুই অংশ কোনোমতে মিলতে পারে না। বুদ্ধির সিদ্ধান্তে স্পষ্টই দুই অংশ বর্তমান—'কে' ও 'কি', 'একটা কিছু' ও 'তার সম্বন্ধে কিছুর উল্লেখ'। এই দুই অংশের মধ্যে যে বিরাট খাদ, বুদ্ধি প্রাণপণে তা জোড়া দিতে চায়, কিন্তু পারে না। নিজের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বুদ্ধি কিছুতেই মিটাতে পারে না, আর মিটাতে পারে না বলেই তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

বুদ্ধি যে পরমসত্তাকে জানতে পারে না, জানতে গেলে বিরোধ ধারণার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলে, এ কথা এমন কিছু নতুন নয়; কাণ্ট তাঁর "শুদ্ধ বুদ্ধির বিচারে" তা প্রমাণ করেছেন। কেবল ব্রাডলির ভঙ্গীটা নতুন। তাছাড়া কাণ্ট ওখানেই দর্শন শেষ করেছেন, ব্রাডলি কিন্তু তাতে রাজি নন। বস্তুত এই নেতিমূলক কথার পিছনে অনিবার্যভাবেই আরো কিছু এসে পড়ে, ব্রাডলি বললেন, কাণ্ট সেদিকে যান নি, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে উপায়ই নেই। বিরোধী ধারণার দ্বন্দ্ব বর্তমান বলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে পরম-সত্তা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায়। সে তথ্য কি এই নয় যে পরমসত্তা বিরুদ্ধধারণার দ্বন্দ্ব-মুক্ত? এ কথা না মানলে বিরুদ্ধ-ধারণার দ্বন্দ্বকে প্রাতিভাসিক বলে কি করে অবজ্ঞা করা চলে? তা হলে, কাণ্টের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কাণ্টের নিগমনের মিল নেই: বুদ্ধি পরমসত্তার সন্ধানে বিভ্রান্ত হলেও সে সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকতে

বাধ্য নয়, তার সম্বন্ধে অন্তত এটুকু তথ্য জানা যায় যে, সে দ্বন্দ্ব-মুক্ত।

কিন্তু এই প্রাতিভাসিক জগতের স্থান কোথায়? অনিত্য বা শূন্য বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও কাজের কথা নয়, কারণ বুদ্ধির কাছে যে ধরা পড়েছে কোথাও-না-কোথাও তার একটা অধিষ্ঠান থাকতে বাধ্য। প্রাতিভাসিক বলে তাকে তো একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। এদিকে পরমসত্তার সংজ্ঞা থেকেই প্রমাণ, তার বাইরে কোনো-কিছুর স্থান থাকতে পারে না। ফলে জগৎও নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ভাবে তার মধ্যেই থাকবে। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলে দ্বন্দ্বকণ্টকিত অবস্থায় থাকতে পারে না। তাই ব্রাডলি বললেন, এ জগৎ মিথ্যা নয়, শূন্য নয়, অলীক নয়—পরিবর্তিত ও পরিশোধিত অবস্থায় পরমসত্তার মধ্যেই তার স্থান। তা হলে পরমসত্তা সম্বন্ধে আরও তথ্য পাওয়া গেল: সে শুধু দ্বন্দ্ববিমুখ নয়, ছন্দোবদ্ধ ও অদ্বিতীয়। তার বাইরে কিছু নেই; প্রতিভাসেরও স্থান তারই মধ্যে, যদিও প্রতিভাস সেখানে রূপান্তরিত।

এই অদ্বিতীয় ছন্দোময় সত্তাই ব্রাডলির ব্রহ্ম। হেগেলীয় মতবাদই, তবু এক বিষয়ে হেগেলের সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ। কারণ হেগেলের মতে এ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধি, ব্রাডলি বলেন বুদ্ধি বিরোধের দ্বন্দ্বে কণ্টকিত। ব্রহ্মের স্বরূপ তাই বুদ্ধি বা জ্ঞান নয়, বুদ্ধির ঊর্ধ্বে যে আধ্যাত্মিক অবস্থা, যার নাম তিনি দিয়েছেন Sentient Experience, তাই। অর্থাৎ ব্রাডলি আধ্যাত্মিক চেতনাকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন: অনুভূতি, বুদ্ধি ও Sentient Experience। অনুভূতিতে দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে না, কারণ সেখানেদ্বন্দ্ব অব্যক্ত। বুদ্ধিতে তা ধরা পড়ে কারণ দ্বন্দ্ব সেখানে ব্যক্ত আরবুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে আর এক চেতনা আছে; দ্বন্দ্ব সেখানে অব্যক্ত নয়, ব্যক্ত নয়, পরিশোধিত, ছন্দে রূপান্তরিত।

ব্রাড্‌লির পর বোসাঙ্কে, ম্যাক্‌টাগার্ট প্রমুখ আরও কয়েকজন ব্রহ্মবাদীর উদয় হয়েছে। কিন্তু ব্রাডলিই নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাম্প্রতিক ব্রহ্মবাদের চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর দর্শনে। উত্তর-দার্শনিকেরা এখানে ওখানে কিছু কিছু কারুকার্য করেছেন, তাতে ব্রহ্মবাদের শোভা হয়ত বেড়েছে কিন্তু নৈয়ায়িক নিশ্চয়তা বেড়েছে কিনা সন্দেহের কথা।

ব্রহ্মবাদের কয়েকটি মূল সূত্র

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ব্রহ্মবাদের কয়েকটি মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পরমসত্তা চেতন-বস্তু। দৃশ্যমান অচেতন জগৎ অলীক না হলেও প্রাতিভাসিক। বস্তু-বিশ্বকে আমরা যে ভাবে দেখি সেইটাই তার প্রকৃত রূপ নয়। এ জগতের খণ্ড দ্রব্যাদি অবশ্যই সত্য নয়—অখণ্ড, অদ্বিতীয় ছন্দোময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ফলে এ জগতে পরিবর্তন, গতি, ক্রিয়া বা ক্রমবিকাশ বলে যে পদার্থের অভিজ্ঞতা হয় সে পদার্থ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা। কারণ, ব্রহ্ম পরিণামশীল হলে হয় মানতে হবে তাঁর ক্রমবিকাশ চলেছে, তিনি ক্রমশ বেড়ে চলেছেন, আর না হয় মানতে হবে তাঁর ক্রমশ অধঃপতন ঘটছে, তিনি কমে আসছেন। উভয় ধারণাই অসম্ভব : তিনি যদি বেড়ে চলেন তা হলে কিসের মধ্যে বাড়ছেন? তাঁর বাইরে তো কিছুই থাকতে পারে না। তিনি কমে চললে বলতে হবে ক্রমশ তাঁর বাইরে কোন কিছুর সত্তা বেড়ে চলেছে। তাও অসম্ভব। ব্রহ্মকে অখণ্ড, অদ্বিতীয় ছন্দোময় সত্তা বলা মানেই তাঁকে অসীম বলে স্বীকার করা : অসীমের বৃদ্ধি সম্ভব নয়, অসীমের সংকোচন সম্ভব নয়

ক্রোচে

ক্রোচে স্বরু করতে চান হেগেল থেকেই, কিন্তু নিছক হেগেল-দর্শনে তাঁর তৃপ্তি নেই। কারণ এখানে অনাবিল সত্যের প্রকাশ নয়, সত্য ও অনৃতের মৈথুন। এক চরম সত্যের উপর হেগেলের স্থিতি সন্দেহ নেই, তবু মিথ্যার আবরণে এ সত্য আবৃত। ক্রোচে তাই বলেন, এই মিথ্যার আবরণ সরিয়ে মূল সত্যের সন্ধান করতে হবে। হেগেলের ভক্ত বহু জন্মেছেন—বহু জাতের বহু ভাবের দার্শনিক—তাঁরা সকলেই প্রেরণা পেয়েছেন হেগেল থেকে। কিন্তু আসল কথাটা তাঁরা কেউই ধরতে পারেন নি। ক্রোচে সেই কথা আবিষ্কার করতে চান। ক্রোচের মধ্যে তাই একদিকে চরম হেগেল-ভক্তি এবং অপর-দিকে হেগেল থেকে নিষ্কৃতির প্রাণপণ চেষ্টা।

তাঁর কাছে তাই প্রধান প্রশ্ন হেগেলের কোন্ কথা আজও প্রাণবান আর কোন্ কথা মৃত, সত্য আবিষ্কারের পথে বাধামাত্র? এর উত্তর পেতে হলে, ক্রোচে বললেন, স্বরু করতে হবে হেগেলের নব্যন্যায় থেকে। নব্যন্যায় বলছি, কারণ ন্যায়শাস্ত্রে হেগেল এক বিপ্লব ঘোষণা করেছিলেন। তার প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন।

দার্শনিক প্রচেষ্টায়, বিশ্বের রহস্য সন্ধানে, মানবমন বারবার থমকে দাঁড়িয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বিরুদ্ধ ধারণার সম্মুখীন হয়ে। উভয় ধারণাই এত গভীর ও প্রাথমিক যে একটিকে আর একটির প্রকার-ভেদমাত্র বলা যায় না; অথচ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এত তীব্র যে মানবমন একই সঙ্গে উভয়কে স্বীকার করতেও রাজি নয়। এ দ্বন্দ্বের পর্যাপ্ত উদাহরণ দর্শনের ইতিহাসে ছড়ানো রয়েছে। 'সত্য'

আর 'মিথ্যা', 'সুখ' আর 'দুঃখ', 'সুন্দর' আর 'কুৎসিত'—এমনি কত কি! স্বভাবতই দর্শনের ইতিহাসে একটা প্রশ্ন বারবার উঠেছে: এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ কি? নিষ্কৃতির পথ অনিবার্য-ভাবেই প্রয়োজন; সে পথ না পেলে দার্শনিক বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। সাবেকি আমলে মাত্র দুটো পথের সন্ধান জানা ছিল: এক, এই দ্বন্দ্বমূলক ধারণার একটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে অপরটিকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা; আর এক, উভয়কেই কোনোমতে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া, দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখেও যেন না দেখা। এই দুই সাবেকি সমাধানের ফলে দর্শনের ইতিহাসে দু ধরনের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়—অদ্বৈত ও দ্বৈত। ক্রোচে বলেন, হেগেল ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন সাবেকি দুটো মতবাদই খেলো, শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত। কারণ একটাকে উড়িয়ে দেওয়াও কোনো কাজের কথা নয়; অপরপক্ষে দ্বন্দ্বকে ঢাকতে চেষ্টা করলেই যে শান্তি পাওয়া যাবে তাও নয়। বস্তুত উভয় প্রচেষ্টাই যে অসম্ভব তার প্রমাণ এক পক্ষের দার্শনিক অসুবিধে বুঝলে এমন কথা বলতে থাকেন যা আসলে মানায় অপরপক্ষের মুখেই। উদাহরণ, অদ্বৈতবাদীর দল যখন সত্য আর অনৃতের কথা বলতে থাকেন তখন শেষ পর্য্যন্ত কি দ্বৈতই তাঁরা মানতে বাধ্য হন না? সাবেকি সমস্যা দুটির কোনো একটিই যে স্বীকার্য নয় দর্শনের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য রয়েছে। এ ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে একটানা কিছুদিন জড়বাদের জের চললে দার্শনিকদল যেন হাঁপিয়ে ওঠেন, এবং সুরু হয় অধ্যাত্মবাদের যুগ। কিন্তু এখানেও স্থিতি নেই; আবার ফিরতে হয় জড়বাদের কথায়। ইতিহাসের এই চাঞ্চল্যই কি প্রমাণ করেনা যে বিরোধমূলক দুটি ধারণার একটিকে বর্জন করা কাজের কথা নয়, আবার উভয়কে একসঙ্গে স্বীকার করে নেওয়াও অসম্ভব।

সহজবুদ্ধির কথা অবশ্য আলাদা। দ্বন্দ্বমূলক ধারণার মুখোমুখি হতে তার সংকোচ নেই। জীবনকে সে সংগ্রাম বলে মেনেছে—দ্বন্দ্ব ত এখানে আছেই। তবুও সংগ্রাম হলেও শেষ পর্যন্ত বেসুরো কিছু নয়। সংগ্রাম আছে তবু সংগ্রামকে জয় করা যায়। নতুন সংগ্রাম আবার হয়ত ওঠে, তাকে জয় করতেও বুক বাঁধতে হবে: এর নামই ত জীবন। ফলে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েও সহজবুদ্ধি হাল ছাড়ে না, নিজের পথ নিজে বেছে নেয়। তবু এ বুদ্ধির মুস্কিল, কেমন করে সে এই সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয় তা বুঝিয়ে বলতে পারে না।

ক্রোচে বলেন হেগেলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এই মূল সমস্যার দার্শনিক সমাধান। এত সহজে, এত অনায়াসে এ সমাধান তিনি করছেন যে আমাদের যেন অবাকও লাগে না: কলম্বাস যেমন টেবলের উপর ডিম দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছিলেন অনেকটা সেই রকম। বিরুদ্ধ ধারণার একটিও সত্যাভাস নয়, অথচ তাদের একত্র সমাবেশও অসম্ভব নয়। কেননা বিরোধ আসলে এদের পরস্পরের মধ্যে, এদের সমন্বয়ের সঙ্গে নয়। দ্বন্দ্বের সমন্বয়, বিরুদ্ধ ধারণার সংশ্লেষণ, —মূল সত্য এখানেই। পরম সত্তা অর্থহীন ফাঁপা শব্দমাত্র নয়; রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে সে উজ্জ্বল আর জীবন্ত। তাই দ্বন্দ্ব সে এড়িয়ে আসে না, দ্বন্দ্বকে আত্মসাৎ করে নিজকে সমৃদ্ধ করে। যে দর্শন এ দ্বন্দ্বকে পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান চায় তার কপালে জুটবে সত্যের শবদেহ, জীবন্ত সত্য নয়। কারণ জীবন মানেই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বেই শেষ নয়, দ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তবু দ্বন্দ্ব না থাকলে, তাকে জয় করবার প্রেরণা না থাকলে, জীবনের অর্থ কতটুকু?

এই দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণসূত্রে হেগেল যে কটি বিস্ময়কর দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন ক্রোচে সেগুলি সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রথমত পরম-সত্তার গতিশীল রূপ কল্পনা। এ কল্পনা য়ুরোপীয় দর্শন হেরাক্লাইটাসের

সত্তার এক রূপ ইতিহাস, অপর রূপ দর্শন। এই কারণেই হেগেল এদের অভিন্ন মনে করেছেন।

'যে দর্শনের সঙ্গে আমার মনের মিল অতখানি, সেই দর্শন প্রথম পড়বার সময় অনেকদিন পর্যন্ত কেন মনে মনে তীব্র বিদ্বেষ ছিল?' ক্রোচে প্রশ্ন তুলেছেন এবং উত্তরে বলেছেন—তার কারণ নিশ্চয়ই হেগেলের মধ্যে অবিমিশ্র সত্যের অভাব। ফলে খুঁজে দেখতে হবে হেগেলের কোন্ কথায় আজও প্রাণ আছে এবং কোন্ কথা আজ মৃত। এবং হেগেলের নব্যন্যায়ই যেহেতু তাঁর বিশেষ কীর্তি, ভ্রান্তির সন্ধানও করতে হবে সেখানেই।

এই ভ্রান্তি-বিচারের আগে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় ও স্বতন্ত্র ধারণার সমন্বয়ের মধ্যে ক্রোচে প্রভেদ টেনেছেন। 'কল্পনা' ও 'বুদ্ধি',—এ দুটি ধারণা স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু এ দুটি কি বিরুদ্ধ, যেমন বিরুদ্ধ 'সুন্দর' ও 'কুৎসিতে'র ধারণা? ক্রোচে বলেন তা মোটেই নয়, কারণ বুদ্ধি ও কল্পনার একত্র সমাবেশ অবাস্তব ত নয়ই বরং চেতনার মূলে উভয়ের অবস্থিতিই স্পষ্ট। কিন্তু সুন্দর ও কুৎসিত, সৎ ও অসৎ, ও রকম পাশাপাশি থাকতে পারে না। ফলে স্বতন্ত্র ধারণা ও বিরুদ্ধ ধারণার প্রভেদ ভুললে চলবে না। অতএব বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয়ের জন্যে যে নব্যন্যায় তার ব্যবহার স্বতন্ত্র ধারণার ক্ষেত্রেও করতে গেলে অনর্থ বাধবার কথা। কারণ, হেগেল ঠিকই দেখিয়েছেন যে বিরুদ্ধ ধারণাগুলির এক-একটিকে আলাদা ভাবে দেখতে গেলে তাদের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না, প্রত্যেকটি অর্থহীন ফাঁপা শব্দে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ সৎ অসতেরই নামান্তর। এবং এ দুটি বিরুদ্ধ ধারণার সংশ্লেষণে যে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় একমাত্র তার মধ্যেই অর্থ ও সত্য বিরাজমান। কিন্তু, ক্রোচে বলেন, স্বতন্ত্র ধারণার বেলায় এ কথা মোটেই সত্যি নয়; স্বতন্ত্র ধারণাগুলির সমন্বয়

ও ভাবে প্রয়োজন নেই ; এখানে একমাত্র প্রয়োজন উন্নত ও অবনতের প্রভেদ টানা। কারণ দুটি স্বতন্ত্র ধারণার মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে, ফলে প্রথমটির নিজস্ব সত্তা পরিপূর্ণ থাকলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আশ্রয় করতে বাধ্য। কিন্তু বিরুদ্ধ ধারণাদ্বয়ের মত একটির ধর্মও এমন নয় যে নিছক নিজে নিজে অর্থহীন শব্দে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ক্রোচে বলেন এ প্রভেদ হেগেল বুঝতে পারেন নি ; বিরুদ্ধ ভাবনার সমন্বয় ছিল যুগান্তকারী আবিষ্কার, এবং এ আবিষ্কারের পর হেগেলের নেশা ধরেছিল। তাই তিনি সর্বত্রই এর প্রয়োগ করতে যেতে গেলেন—যেখানে উচিত নয় সেখানেও, স্বতন্ত্র ধারণার ক্ষেত্রেও। ফলে তাঁর দর্শনের মূলে সত্য থাকলেও মিথ্যার আবরণে তা ঢাকা পড়ল। ক্রোচে এ পার্থক্য মনে রেখে পরমসত্তার নতুন বর্ণনায় দর্শনের মুক্তি খুঁজলেন।

পরমসত্তার মূলে দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণের প্রেরণা, সে সত্তা তাই চিৎস্বরূপ, গতিশীল, প্রাণময়, চঞ্চল—এ ত হেগেলের মহৎ আবিষ্কার। কিন্তু তার গতিপথে যে যে পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সে চলে, নিজেকে বিকাশ করে, সে পর্যায়গুলি স্বতন্ত্র, বিরোধী নয়। ফলে তাদের মধ্যে উন্নত-অবনতের প্রভেদ থাকলেও, দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণপদ্ধতিতে তাদের মিলন খোঁজা অনর্থক। ক্রোচে বলেন, হেগেল এ কথা ধরতে পারেন নি অথচ এ কথাকে মূলসূত্র হিসেবে ধরে নিলে তবেই দর্শনের কাঠামোটা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ দর্শন ত পরমসত্তার বর্ণনা মাত্র। এবং সে সত্তা মন বা চিৎ, যার স্বরূপ সৃষ্টি বা ক্রিয়া। ফলে দর্শনের প্রধান সমস্যা মানসক্রিয়ার পর্যায় নির্ণয়ন! তাই ক্রোচে প্রশ্ন তুলেছেন, চিৎস্বরূপ পরমসত্তার গতিপথের পর্যায়গুলি কী কী? এ প্রশ্নের উত্তরেই তাঁর দর্শনের বহিঃরেখা খুঁজে পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন এ পর্যায়গুলিকে প্রাথমিক ভাবে দুভাগে ভাগ করতে হবে—জ্ঞানগত ও কর্মগত। এবং এ দুই ভাগই স্বতন্ত্র, বিরোধী কিছু নয়। জ্ঞানগত পর্যায় যদিও স্বাশ্রয়ী ও স্বাধীন, তবুও কর্মগত পর্যায় অনিবার্য অধিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞানগতের মুখাপেক্ষী।

অর্থাৎ কর্মের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও নিছক জ্ঞানের অস্তিত্ব ও অর্থ আছে। জ্ঞান মানেই কোনো ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান, এমন নয়। অপরপক্ষে কিন্তু জ্ঞান সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কোন ক্রিয়াই সম্ভব নয়। কাজ করতে হলে অনিবার্যভাবেই জ্ঞানের প্রয়োজন, নইলে কাজ আর হবে না, হবে শুধু উন্মত্ত ব্যবহার।

একই ভাবে, এই দুই পর্যায়কে আবার স্বতন্ত্র দুটি করে বিভাগে বিভক্ত করতে হবে। জ্ঞানগত বিভাগের দুই পর্যায় হল সজ্ঞা ও প্রত্যয়, এবং কর্মগত বিভাগের দুই পর্যায় হল বৈষয়িক ও নৈতিক। এবং যেভাবে কর্মগত বিভাগ জ্ঞানগত বিভাগের উপর নির্ভর করে ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যয় নির্ভর করে সজ্ঞার উপর, নৈতিকের অনিবার্য অধিষ্ঠান বৈষয়িক: প্রত্যয়ের কথা বাদ দিয়েও নিছক সজ্ঞার অস্তিত্ব যে রকম স্বীকার্য ঠিক সেই রকমই নীতির কথা বাদ দিয়েও নিছক বৈষয়িকের সত্তা সম্ভব।

তাহলে মোটের উপর মানসক্রিয়ার চারটি পর্যায়: সজ্ঞা প্রত্যয়, ব্যবহার ও নীতি। প্রথম দুটি মিলে জ্ঞানগত পর্যায়, দ্বিতীয় দুটি মিলে কর্মগত। জ্ঞানগত যেমন কর্মগতের উপর নির্ভর খোঁজে না কিন্তু কর্মগত জ্ঞানগতের উপর নির্ভর খোঁজে, তেমনি প্রত্যয় যদিও সজ্ঞার উপর নির্ভরশীল তবুও সজ্ঞা প্রত্যয়-নির্ভর নয়; নীতি ব্যবহার-নির্ভর হলেও ব্যবহার নীতি-নির্ভর নয়।

মানসক্রিয়ার এই চারটি পর্যায়ের চরম উৎকর্ষ যথাক্রমে সুন্দর,—

সত্য, উপযোগ ও সাধু। সাধারণভাবে বর্ণনা দিতে হলে বলতে হবে পরমসত্তা 'মন', সৃষ্টিই তার স্বরূপ। এই মনের প্রথম সৃষ্টি বিশুদ্ধ প্রতিরূপ। এ সৃষ্টির পিছনে মনন নেই, আছে শুধু সজ্ঞ শিল্পে তার অভিব্যক্তি। তারপর সেই বিশুদ্ধ প্রতিরূপগুলিকে আশ্রয় করে সুরু হয় মনন ক্রিয়া। প্রতিরূপ এখানে প্রত্যয়ভুক্ত হয়। শিল্পের রাজ্য থেকে মন এসে পড়ে ন্যায়শাস্ত্রের রাজ্যে। শিল্পজগতের চরম আদর্শ সুন্দর, সত্য-অসত্যের প্রশ্ন সেখানে নেই। নৈয়ায়িক রাজত্বের বিশেষ পরিচয় সত্যের সন্ধান। তবুও এই নৈয়ায়িক রাজত্ব শিল্প-রাজত্বের মুখাপেক্ষী; কারণ শিল্পের মূল লক্ষণ প্রতিরূপের প্রকাশ, এবং ন্যায়শাস্ত্র অনিবার্যভাবেই "প্রকাশ্য" হতে বাধ্য। ভাষায় প্রকাশ হয়নি এমন ন্যায়শাস্ত্র একান্তই অসম্ভব। একই ভাবে ক্রিয়াপর্যায়ের মধ্যেও ক্রোচে স্তরবিভাগ করে দেখিয়েছেন প্রথম স্তর স্বাধীন ও স্বাশ্রয়ী, যদিও দ্বিতীয় স্তর অনিবার্য ভাবেই প্রথমটির উপর নির্ভর করে।

দর্শনের উদ্দেশ্য এই মানস ক্রিয়াগুলির পরিচয় ও আলোচনা: কারণ মানসক্রিয়াই পরমসত্তা এবং দর্শন পরমসত্তার পরিচয় মাত্র। ক্রোচে তাই দর্শনকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করেছেন। নন্দনতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা

সাম্প্রতিক সংস্কৃতি-জগতে ক্রোচের নাম বিশেষ করে তাঁর নন্দন-তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। এমন কি, যে-মহলে তাঁর দার্শনিক সমাদর পৌছয় নি সে-মহলেও শিল্পসমালোচক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ। তাই বিশেষ করে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করতে হবে।

মনের প্রথম সৃষ্টি প্রতিরূপ। ক্রোচে বলেন, এই প্রতিরূপ সৃষ্টিও যা তার প্রকাশও তাই। সজ্ঞা ও প্রকাশ একই ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। এবং যেহেতু সহজজ্ঞানের প্রতিরূপ সৃষ্টিই শিল্প, সেই হেতু

শিল্প প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অল্প কথায় এই হল ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব; যদিও এর ব্যঞ্জনা গভীর।

প্রথমত সজ্ঞার প্রতিরূপসৃষ্টি বলতে ক্রোচে ঠিক কি বুঝতে চান। একটা অতিপ্রচলিত অভিজ্ঞতার আলোচনায় সুরু করলে সুবিধে হবে। কাজের তাড়া নেই, জ্ঞানের উৎসাহ নেই, মনকে তার স্বাচ্ছন্দ্যের পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; এ জাতের অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এ অবস্থায় মন ঠিক কি ধরনের কাজ করে? হয়ত দূর আকাশের মেঘে নানান রকম কল্প-চিত্র খুঁজতে থাকে। জ্ঞান নয়, ক্রিয়া নয়,—কারণ মন তখন জানতে উৎসুক নয়, সদসৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না, লাভলোকসানের হিসেব নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে না। নিছক কল্পনা দিয়ে সে সৃষ্টি করে প্রতিরূপের। হয়ত উদ্ধৃত উদাহারণে জ্ঞানের হাত থেকে পুরো মুক্তি নেই, কারণ এ রকম শিথিল ও অলস মুহূর্তেও মন যে-জাতের ছবি আঁকে তার মধ্যেও অতীত জ্ঞান সংস্কার হিসেবে প্রচ্ছন্ন। এখানেও তাই নিছক সজ্ঞার সৃষ্টি পাওয়া যাবে না। বিশুদ্ধ সজ্ঞার নির্দেশ পেতে হলে আর একটু এগতে হবে। ক্রোচের দেওয়া উদাহরণই তোলা যাক: চিত্রকর চন্দ্রালোকের যে শিল্পরূপে মগ্ন, সংগীতজ্ঞ যে সংগীত-প্রসঙ্গে মুগ্ধ, বা কবি গীতিকাব্যের যে পংক্তি সাজাচ্ছেন,—সে-সব ক্ষেত্রেও সজ্ঞা প্রতিরূপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধ প্রতিরূপ, প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। কারণ এ সব ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি প্রতিরূপ বৈশিষ্ট্যময় ও মূর্ত, অথচ প্রত্যয়-মাত্রই সামান্য ও অমূর্ত হতে বাধ্য।

ক্রোচে এই বিশুদ্ধ সজ্ঞার প্রতিরূপ সৃষ্টির নামই দিয়েছেন "প্রকাশ"। তাঁর মতে সৃষ্টি ও প্রকাশ একই ক্রিয়ার দুই দিক মাত্র। প্রচলিত ধারণার উপর নির্ভর করে এখানে নিশ্চয়ই মস্ত আপত্তি উঠবে। সাধারণ মানুষ ভাবে তার মনেও খুব গভীর ভাবের উদয় হয়, এক-

গভীর যে ভাব-হিসেবে মহৎ কবির বা শিল্পীর ভাবের সঙ্গে পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তার সঙ্গে মহৎ শিল্পীর তফাৎ শুধু এই যে সে তার ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, শিল্পী নিজের জন্মগত ক্ষমতা ও অধীত বিদ্যার সাহায্যে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে। শিল্পীর মহিমা তাই বক্তার গভীরতায় নয়, প্রকাশের কৌশলে। "প্রায়ই শুনতে পাই লোকে বলছে তার মনেও অনেক গভীর কথা জাগে, সে-কথা ভাষায় ব্যক্ত করতে সে পারে না, এই যা। কিন্তু," ক্রোচে বলেন, "আসল কথা হল সত্যিই যদি সে জিনিস ওদের মধ্যে থাকত তাহলে তাকে সুন্দর ছন্দোময় শব্দে ওরা প্রকাশ করতেও পারত। ওরা ভাবে র‍্যাফেলের ম্যাডোনাকে মনে মনে কল্পনা যে-কেউ করতে পারে; তবু র‍্যাফেল ছিলেন র‍্যাফেল, কারণ মনের ম্যাডোনাকে তিনি ক্যান্‌ভাসে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে এতবড় ভুল আর হয় না; মাইকেলেঞ্জেলো বলেছেন মানুষ ছবি আঁকে হাত দিয়ে নয়, মন দিয়ে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি 'শেষ পংক্তি ভোজ' ছবি আঁকার সময় দিনের পর দিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাটাতেন, তুলি স্পর্শও করতেন না। দেলা গেস্ এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে লিওনার্দো বলেন, "প্রতিভাশালীর দল যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে তখনই তারা সবচেয়ে সক্রিয়, কারণ মনের মধ্যে তখন সৃষ্টির তোলপাড় পড়ে গিয়েছে!" ক্রোচে উপমা দিয়ে কথাটা আরও পরিষ্কার করতে চান: "বিষয়সম্পত্তি খোয়া যাবার পরও কেউ হয়ত পাটিগণিতের ধাঁধায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে। সে পাটিগণিত অলীক সম্পত্তি নিয়ে শুধু হিসেবনিকেশ করায় মত্ত। নিজের চিন্তা আর কল্পনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় মগ্ন মানুষের অবস্থাও সমান। আগের লোকটিকে বলব টাকাকড়ি কী আছে গুণেই দেখ না। দ্বিতীয় লোককে বলব

এই নাও পেনসিল, মনে মনে যে ধারণা রয়েছে ভাবছ একবার চেষ্টাই কর না তাকে প্রকাশ করতে।" ভাষার অতীত কোনো ভাবের সত্তা ক্রোচে মানতে রাজি নন ; ভাব যদি সত্যিই গভীর হয় প্রকাশ আসবে অনিবার্য পথেই।

তাই বলে সজ্ঞা জিনিষটায় মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটে অধিকার নেই। মানসক্রিয়ার চারটি স্তরই প্রত্যেক মানুষে বর্তমান, প্রত্যেকেরই মনের ধর্ম। তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে : প্রত্যেক মানুষই কি শিল্পী ? কারণ স্বজ্ঞামূলক ক্রিয়ার নামই শিল্পসৃষ্টি এবং এ ক্রিয়া সকলের মধ্যেই বর্তমান। উত্তরে ক্রোচে বলেন, শিল্পী সব মানুষই। তাহলে যাকে আমরা শিল্পী বলে মানি আর যাকে বলি সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে তফাৎ ঠিক কোথায় ? এ তফাৎ, ক্রোচে বলেন, জাতের দিক থেকে বা গুণের দিক থেকে নিশ্চয়ই থাকতে পারে না ; এ তফাৎকে শুধু পরিমাণের তফাৎ বলে মানতে হবে ; অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পগুণ সংকীর্ণ, শিল্পীর মধ্যে সে গুণের প্রাচুর্য। কিন্তু দর্শন তো পরিমাণের প্রভেদ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয় ; তাই দর্শন সাধারণ মানুষ আর শিল্পীকে মোটামুটি এক কোঠায় ফেলেই নিশ্চিন্ত।

যে-কথা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে সত্যিই বিশিষ্ট তা হল শিল্পের অবস্থান-নির্ণয়। শিল্পের স্থান জ্ঞানের রাজত্বে নয়, ক্রিয়ার রাজত্বেও নয়। শিল্প স্বাধীন ও স্বাশ্রয়ী। হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদল একে জ্ঞানের রাজত্বে ফেলতে চেয়েছেন, তাঁদের মতে শিল্প আর কিছুই নয়, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের পথে আত্মবিকাশ। অপরপক্ষে টলস্টয় প্রমুখ মনীষী নিছক ক্রিয়ার রাজত্বে শিল্পের সন্ধান চেয়েছিলেন ; তাঁদের মতে শিল্প সুনীতির সুচারু পরিবেশন মাত্র। ক্রোচে উভয় মতবাদই অগ্রাহ্য করেন ; শিল্পের নিজস্ব সত্তা আছে, সে সত্তা স্বাধীন ও স্বাশ্রয়ী।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন

ইংরেজ দার্শনিক মূরের গ্রন্থরচনা স্বল্প। নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথি দুটি বাদ দিলে বাকি থাকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত দার্শনিক প্রবন্ধ, সংখ্যায় এত কম যে সংকলিত অবস্থায় একটি গ্রন্থের মধ্যেই সব কটি ধরে গিয়েছে। আরও একটা কথা লক্ষ্য করবার মতো, তাঁর লেখায় দার্শনিক সমস্যার সমাধান বিরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, কোনো কোনো কথা মানা সম্ভব নয় তা খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন, যে-কোন সামান্য সমস্যাকে কতদিক থেকে ভেবে দেখা উচিত তার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু সমস্যাগুলির সমাধান করার উৎসাহ যেন নেই। অথচ মজার কথা, সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রধান প্রেরণা পেয়েছে এই মিতভাষী, সমাধানবৈরাগী দার্শনিকের কাছ থেকেই। ব্যাপারটাকে নিছক ঐতিহাসিক আপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বরং এর মধ্যেই সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে: এ দর্শনের বলবার কথা আসলে কম, এবং সেটুকুও প্রধানত নেতিবাচক। দার্শনিক সমস্যা-সমাধানের চেয়ে দর্শনের ভ্রান্তিবিচারই এর প্রধান উপজীব্য। এখানে কোনো মূল বিশ্বালোচনকে বিভিন্ন দার্শনিক পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করতে চান নি। যে-কথায় সকলের উৎসাহ সে-কথা বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন।

এই বিজ্ঞানবাদখণ্ডনে প্রায় প্রত্যেকেই প্রেরণা পেয়েছেন মূরের কাছে। তাই সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের গুরুদেব মূর। রাসেল, আলেকজেণ্ডার, নব্য এবং বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদী প্রভৃতির মধ্যে যে-কথায় মিল তা মোটামুটি বিজ্ঞানবাদ-

খণ্ডনের কথা এবং যে যুক্তির উপর নির্ভর করে তাঁরা এ খণ্ডন সমাধা করতে চান তা মূলত মূর-নির্দিষ্ট যুক্তি। অবশ্য আরও কয়েকটি ছোট-খাট কথায় পরস্পরের মধ্যে মিল পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেগুলি বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের উপসিদ্ধান্ত মাত্র। বিশ্বের রূপনির্ণয়ে বিভিন্ন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে শুধু যে অমিল তাই নয়, বিরোধিতাও। তাই হালের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের আলোচনায় বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনই প্রাধান্য পেতে বাধ্য।

মূরের ছোট্ট প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন' সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দর্শনে বিরাট বিপ্লব ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞানবাদকে এ রকম সামনাসামনি, এ রকম স্পষ্ট ও তীব্র, এ রকম নির্মম ও নির্ভীক ভাবে খণ্ডন করবার চেষ্টা বিরল। মূল বক্তব্য ছোটই: বিজ্ঞানবাদ, তা সে যে-জাতেরই হোক-না কেন, প্রেরণা পেয়েছে বার্কলির কাছ থেকে, এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তা বাদ দিলে সমস্ত বিজ্ঞানবাদেরই এক বক্তব্য—সত্তার মূল পরিচয় তার অনুভূতিতে। কিম্বা, যা একই কথা, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্তা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এ মতের সমর্থনে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন: দর্শনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা, যা জানা নেই তার সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকারও কারুর থাকতে পারে না। তাই যে জিনিস জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যে পড়ে শুধু তাই নিয়েই দার্শনিকের আলোচনা। কিন্তু এ জাতের সমস্ত জিনিসই কি জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে বাধ্য নয়? তাই জ্ঞাতার বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না এমন জিনিসের সত্তা দার্শনিকের পক্ষে মানা অসম্ভব। সরল শোনালেও এ যুক্তি জোরালো; দর্শনে এর প্রভাব ব্যাপক ও গভীর।

মূর দেখাতে চান, যেমন সরল এই যুক্তি তেমনি সরল ভ্রান্তির উপরই তার প্রতিষ্ঠা। 'জ্ঞান'কে বিশ্লেষণ করতে হলে দুটো জিনিসের তফাৎ

করতেই হবে—এক হল চেতনা আর-এক হল চেতনার বিষয়; চেতনার উপরই সমস্ত ইন্দ্রিয়সংবেদনার স্থিতি এবং চেতনার বিষয়ের দরুণই দুটি ইন্দ্রিয়সংবেদনার মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ। বিজ্ঞানবাদীর দল এই সহজ তফাৎটা ধরতে পারে না। 'নীল রঙ'-এর জ্ঞান এবং 'লাল রঙ' এর জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। এ প্রভেদ কিসের উপর নির্ভর করে? চেতনামাত্রের উপর নিশ্চয়ই নয়: কারণ চেতনা উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। ফলে মানতেই হবে এ প্রভেদ বস্তুর উপর নির্ভর করে—সে বস্তু চেতনা নয়, চেতনানিরপেক্ষ বিষয়মাত্র। বিষয়ের বিভিন্নতার জন্যেই জ্ঞান বিভিন্ন হয়, বিষয় যখন 'নীল রঙ' তখন জন্মায় 'নীল রঙ'-এর জ্ঞান; বিষয় যখন 'লাল রঙ' তখন 'লাল রঙ'-এর জ্ঞান। ফলে 'নীল রঙ-এর জ্ঞান' এবং 'নীল রঙ' এ দুয়ের প্রভেদ ভুললে চলবে না। প্রথমটি বিষয়মাত্র, দ্বিতীয়টির উৎপত্তি বিষয় ও চেতনার সংস্পর্শ থেকে। জ্ঞানমাত্রেই যেমন চেতনানির্ভর ঠিক তেমনিই চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুনির্ভরও। চেতনা ও বিষয়, এ দু'য়ের যোগাযোগে জ্ঞানের জন্ম; এবং এই যোগাযোগ জিনিসটা এমন কিছু আশ্চর্য রকম যোগা-যোগ নয় যে, তার ফলে সংযুক্ত জিনিষ দুটির একটি আর-একটির উপর সত্তার দিক থেকে নির্ভর করতে বাধ্য। এ কথা বিজ্ঞানবাদীরা ধরতে পারেন নি। তাই তাঁরা মনে করেন বিশ্বসংসার জ্ঞাতার উপর বা চেতনার উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূরের যুক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলেছেন তার উদাহরণ আলেকজেণ্ডার ও নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মধ্যে স্পষ্ট। বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে আলেকজেণ্ডার দুভাগে ভাগ করতে বলেন, মন ও বহির্বস্তু। এক ভাগের একটির সঙ্গে আর-এক ভাগের একটির সংযোগ ঘটলে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। ভেবে দেখতে হবে এ সংযোগ ঠিক কোন্ জাতের।

বিজ্ঞানবাদীর দল এই সংযোগবিচারে মনকে অযথা প্রাধান্য দেয়; মনে করে এই সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভর করে। কেননা অভিজ্ঞতার আওতায় বিষয় সর্বদাই মনের সঙ্গে সংযুক্ত—মন নেই, অথচ বিষয়ের অভিজ্ঞতা এল, এমন উদাহরণ অসম্ভব। কিন্তু আলেকজেণ্ডার বলেন যেহেতু সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মনের অবস্থিতি অনিবার্য, সেইহেতু অভিজ্ঞতার বিষয়ও যে মনের উপর নির্ভর করবে এ-কথার, বিশেষ করে এরকম গোঁড়ামির, সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বস্তুর রাজ্যে রয়েছে এক জাতের গণতন্ত্র। সত্তার দিক থেকে সমস্ত বস্তুর অবস্থাই সমান। তাদের মধ্যে তফাৎ শুধু প্রাধান্যের, গণতন্ত্রে যেমন মেধাবীর প্রাধান্য থাকে সেই রকম। বস্তুর গণরাজ্যে মন সবচেয়ে উন্নত হতে পারে কিন্তু সত্তার দিক থেকে বেশিকমের অধিকারী কেউ নয়। ফলে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যে সংযোগের ফল তা কেবল দুটি স্বতন্ত্র বস্তুর সংযোগ মাত্র। এ সংযোগ অতি সাধারণ একত্র সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়; যেমন একত্র সমাবেশ ঘাস ও গাছের, ডিম ও টেবিলের। ঘাস ও গাছ, ডিম ও টেবিল একত্র সমাবিষ্ট হলেও একটি নিশ্চয়ই সত্তার দিক থেকে আর-একটির উপর নির্ভর করে না। জ্ঞানের বেলাতেও ঠিক তাই। মন ও বহির্বস্তু একত্র সমাবিষ্ট হলেও বস্তু কেন মনের উপর নির্ভর করবে? সাধারণ একত্র সমাবেশের সঙ্গে জ্ঞানগত সমাবেশের তফাৎ সমাবেশের অভিনবত্বে নয়, সমাবিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে একটির উন্নত অবস্থায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় বস্তুই বিষয়মাত্র, কাজেই সেখানে জ্ঞানের উদয় হয় না। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটির জাত উঁচু। সে অপরটিকে জানতে পারে, তাই বলে অপরটিকে সৃষ্টি করে এ-কথা বলা চলে না।

আলেকজেণ্ডারের মতো নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর গোষ্ঠীও বিজ্ঞানবাদ-

খণ্ডনের প্রেরণা পেয়েছে মূরের কাছ থেকে। ১৯১০ সালে ছজন মার্কিন দার্শনিক ঠিক করলেন, দর্শনে দল বেঁধে কাজ করবার দিন এসেছে। এঁরা ছজনেই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ; এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে আলোচনা করাই ভালো। তাই এক-এক পরিচ্ছেদের ভার পড়ল এক-একজনের উপর। কিন্তু গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে। প্রথম দরকার পূর্বপক্ষ খণ্ডন। পূর্বপক্ষ বিজ্ঞানবাদ। তাই এঁরা সুরুতে কোমর বেঁধে একসঙ্গে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করতে বসলেন। ঘোষিত হল নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বন্দ্ব-আহ্বান : বিজ্ঞানবাদ নিয়ে নানান রকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ, এমন কি মার্জিত গালিগালাজ পর্যন্ত। যে অজস্র অনুপপত্তির উপর বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা তার দীর্ঘ তালিকা। তবু এই দীর্ঘ তালিকার পিছনে মূরের মূল যুক্তিই ঘুরে ফিরে দেখা দেয়।

আমরা যা কিছু জানি তা সমস্তই জ্ঞাতবস্তু, তাই জ্ঞাতা-অতিরিক্ত কিছুরই অবস্থিতি সম্ভব নয়। এই তো বিজ্ঞানবাদের কথা। কিন্তু এ কথায় স্পষ্ট অনুপপত্তি : এ পর্যন্ত যা কিছু জেনেছি তা জ্ঞাত বস্তু, তাই বলে বস্তু মাত্রই যে জ্ঞাত হতে বাধ্য তা বললে ন্যায়-বিরোধী অহমিকার প্রকাশ হয়। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী তাই এ অনুপপত্তির নাম দিয়েছেন আপেক্ষিক জ্ঞাতৃসম্বন্ধে-জ্ঞেয়স্বরূপানুপপত্তি (fallacy of Egocentric predicament)।

তাছাড়া কোনো বস্তুকে এখন এক রূপে দেখছি বলে সেই রূপই যে তার একমাত্র রূপ তাও বলা যায় না। আজ যে রাজনৈতিক রিপাব্লিক দলে সে কি এই দলে বরাবর থাকতে বাধ্য ? বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক আজ দেখছি বলেই কি জোর করে বলা যায় যে এ সম্পর্ক বস্তু কখনো কাটাতে পারে না ? অথচ বিজ্ঞানবাদী যখন এ-কথাই বলেন তখন মানতে হবে তিনি বিশেষ-সম্বন্ধে-সামান্য-সম্বন্ধ-প্রতীত্যানুপপত্তির (fallacy of exclusive particularityর) দোষে দুষ্ট।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের আর একটা যুক্তি ধরা যায়। 'পাগল' 'আগল' প্রভৃতি শব্দে 'গ' অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর। তাই বলে কি জোর করে বলা যায় যে 'গ' সর্বদাই শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর হতে বাধ্য? বিজ্ঞানবাদী কিন্তু এই রকম মূর্খতাই প্রকাশ করে: বস্তুকে কয়েকটি দৃষ্টান্তে জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত দেখে গায়ের জোরে বলতে চায় যে জ্ঞানের সঙ্গে বস্তু জড়িত হতে বাধ্য। এ হল 'প্রাথমিক-বর্ণনায়-সংজ্ঞা-নির্ণয়-অনুপপত্তি (fallacy of definition by initial predication)। তারপর নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল যাকে অযথা-প্রাধান্য-অনুপপত্তি (fallacy of illicit importance) বলে বর্ণনা করেছেন তাও মোটের উপর একই জিনিস। কোনো-কিছুর একটি অতিসাধারণ লক্ষণের উপর খুব বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়—কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে তা হলে এই ভালোবাসাকেই তার সর্বস্ব বলে বর্ণনা করা উচিত নয়, এই ভালোবাসার উপরই তার সত্তা নির্ভর করে না। তেমনি অনেক উদাহরণে বস্তুকে জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখে নিশ্চয়ই এমন কথা বলা চলে না যে, বস্তু জ্ঞানের সম্পর্ক ছাড়া থাকতে পারে না। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর এই সব যুক্তি যে মুর-অনুপ্রাণিত সে-কথা স্পষ্ট। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বন্দ্ব-আহ্বানের বাকি কথার দার্শনিক মূল্য সংকীর্ণ: বিজ্ঞানবাদী ভাষাব্যবহারে অনভিজ্ঞ; চেতন মন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অর্থ না বুঝেই ব্যবহার করে। তাছাড়া এমন কয়েকটি শব্দ তারা ব্যবহার করে যেগুলির কোন অর্থই হয় না—যেমন অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত, অসীম ইত্যাদি।

এই তো গেল বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনের মোটামুটি পরিচয়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন ছাড়াও, বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনের উপসিদ্ধান্ত হিসেবেই, সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অন্তত আর-একটা দিক উল্লেখ করতে হয়। প্রত্যক্ষ প্রমার বিচার।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, তা সে প্রাচীনই হোক আর সাম্প্রতিকই হোক, জ্ঞাতানিরপেক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ ঘটে কেমন ভাবে? উত্তরে সেকালের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী বলতেন, প্রত্যক্ষের বেলায় মনের উপর বহির্বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, বহির্বস্তুকে জানা যায় সেই প্রতিবিম্বের অনুসরণ করে। এ-কথায় কিন্তু বিপদ আছে। যদি মানতেই হয় যে বহির্বস্তুর একমাত্র স্বাক্ষর তার মানস প্রতিবিম্বে তা হলে শেষ পর্যন্ত তার সত্তা মানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এবং মোটামুটি বিজ্ঞানবাদের পথই সরল হয়ে যায়। কেননা উক্ত মতে বস্তুকে নিছক বস্তু হিসেবে কোথাও পাওয়া গেল না, যা পাওয়া গেল তা শুধু মানস প্রতিবিম্ব। এবং এই প্রতিবিম্বের অতিরিক্ত বস্তুকে কোথাও ধরা যায় না বলেই তার সত্তা স্বীকার করা শেষ পর্যন্ত অযৌক্তিক। এইভাবে প্রতিবিম্ববাদকে একবার মেনে নিলে চরম বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে আর নিষ্কৃতি নেই।

তাই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করে। প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণে 'মন' আর 'বস্তু' ছাড়াও 'মনে বস্তুর প্রতিবিম্ব' নামক এক তৃতীয় জিনিস মানবার কোনো দরকার নেই। মন বিষয়কে বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তিতায় নয়, একেবারে সোজা-সুজি, একেবারে অন্তরঙ্গ ভাবে। অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে মনের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের নামই প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমগ্র বস্তুর সঙ্গে নয়, বস্তুর অংশ-মাত্রের সঙ্গে। কাজেই একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়; অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর বিভিন্ন দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বস্তুর এই সব বিভিন্ন দিকগুলির নাম 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত'। উদাহরণ: ধরা যাক সামনের একটা টেবিল সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ ঘটছে। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী বলবেন প্রত্যক্ষ হচ্ছে সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রত্যক্ষে পুরো টেবিলটার সন্ধান কি পাওয়া যায়? তা সম্ভব নয়।

টেবিলের যখন এক পিঠ দেখি তখন কি তার অন্য দিকটা চোখে পড়ে? তাই যদিও মন নিরপেক্ষ একটা টেবিল বাইরে রয়েছে এবং সে টেবিলের প্রকাশ হয় প্রত্যক্ষে তবুও তখন সে টেবিল যে একসঙ্গে পুরোপুরি জানতে পারি এমন কোনো কথা নেই। প্রত্যক্ষে যে জিনিসের প্রকাশ সে জিনিস মন-নিরপেক্ষ হলেও বহির্বস্তুর সমগ্র সত্তা নয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় তবুও বিষয়ের সবটুকু নয়। যেটুকু প্রত্যক্ষ করা যায় সেটুকুর নামই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। রাসেল তাই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয়বোধের সময় যেটুকু সাক্ষাৎভাবে জানি তার নাম দেওয়া যায় ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেমন রঙের ছোপ, শব্দ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি। এই সব জিনিসকে সাক্ষাৎভাবে জানার যে অভিজ্ঞতা তার নামই সংবেদন। চোখে রঙ দেখলে রঙের সংবেদন ঘটে, কিন্তু রঙ জিনিসটা সংবেদন নয়, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে বহির্বস্তু জিনিসটে আসলে ঠিক কী রকম? ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কোন্ জাতের? টেবিল বলতে যে জিনিষ বুঝি তাকে জানবার উপায় কি? আমরা জানি মাত্র কয়েকটি ইন্দ্রিয়োপাত্ত: বাদামী রঙ, কাঠিন্য, চতুষ্কোণ ইত্যাদি। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীরা বিপদে পড়েন। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে না-বলা যায় বহির্বস্তুর অংশ, না-বলা যায় বহির্বস্তুর উৎস। 'অংশ' বলার বিপদ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথাকথিত একই বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যায়—সামনে থেকে, দূর থেকে, পাশ থেকে, কাছ থেকে, নানান ভাবে বস্তুর দিকে তাকালে পাওয়া যায় নানান রকম ইন্দ্রিয়োপাত্ত। এগুলির মধ্যে মিল থাকা দূরের কথা বরং ধরা পড়ে অসংলগ্নতা। তা হলে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বস্তুর

অংশ বলা যায় না, বলা যায় না বস্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের যোগফল। অপরপক্ষে বস্তুকে ইন্দ্রিয়োপাত্তের উৎস বলে বর্ণনা করাও বিপদের। কারণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুর অংশ না হয়ে বস্তুপ্রেরিত সংবাদমাত্র হয় তা হলে শুধু যে বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকতে বাধ্য তাই নয়, প্রতিবিম্ববাদের দুর্যোগ থেকেও নিস্তার নেই। কারণ মন যাকে জানে সে তো ইন্দ্রিয়োপাত্ত, বস্তু নয়; ফলে জ্ঞান সর্বদাই ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞান, বস্তুর জ্ঞান কখনোই নয়। তাছাড়াও এমন উদাহরণ দেখানো সম্ভব যে-ক্ষেত্রে বস্তু অবর্তমানেও ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রত্যক্ষ ঘটছে—যেমন নেশার ঘোরে মানুষ শূন্যে কত কীই তো দেখতে পায়। সেখানে ইন্দ্রিয়োপাত্ত নিঃসন্দেহে বর্তমান, কিন্তু তার উৎস হিসেবে কোনো বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

হালের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর তাই দুদিকে বিপদ। প্রতিবিম্ববাদে ফেরা সম্ভব নয়, তাই ইন্দ্রিয়োপাত্তের কথা তুলতেই হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বস্তুসত্তার সম্বন্ধ-নির্ণয়ও কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে দেন। রাসেল বলেন, আসলে এখানে সমস্যা বলে কিছু নেই: বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই নেই, কারণ ইন্দ্রিয়োপাত্তের অতিরিক্ত বস্তুর সত্তা অতিকথন মাত্র। কিম্বা অতিকথন বলতে যদি নেহাত সংস্কারে বাধে তা হলে বলা চলে উক্ত বস্তু ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি, বাহ্যিক পদার্থ নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি যেহেতু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সন্ধান পায়, সেই হেতু ইন্দ্রিয়োপাত্ত অতিরিক্ত বহির্বস্তু না মানলে স্বীকার করতে হবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দুনিয়ার অধিবাসী, এবং সব কটি দুনিয়াই সমান সত্য—কোনোটাই মিথ্যে নয়, আত্মকেন্দ্রিক নয়, কারণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত শুধু সত্য নয়, তার সত্তা অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ।

সাধারণ মানুষ যে মনে করে তারা সকলে মিলে একই দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে আছে, সেটা একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কার মাত্র। রাসেল বলেন, এই এক-দুনিয়ার ধারণাটা সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন দুনিয়ার একটা কাজচালানোর মত সমন্বয়, মূর্তভাবে সত্যিই একে পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় একমাত্র নৈয়ায়িক ও গাণিতিক বিচারে।

সব বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীই যে রাসেলের মত কথা বলেন তা নয়। পরস্পরের মধ্যে মতের মিল এখানে নেই। উদাহরণ হিসেবে রাসেল-দর্শনের একটি পর্যায়ের উল্লেখ করলাম। শুধু রাসেলের দৃষ্টান্ত দিলুম কারণ সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এবং তাঁর যে-মতবাদ উল্লেখ করলুম সে মতবাদ তাঁর তৃতীয় এবং সবচেয়ে পরিণত পর্যায়ের মতবাদ।

এ কথা মানতেই হবে যে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধনির্ণয় করতে বসে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা গুরুতর বিপদে পড়েন; তাঁদের অস্থিরচিত্ততা, ও একতার অভাব থেকেই দুর্বলতার প্রমাণ হয়। মূর, নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের গুরুদেব মূর, হয়ত সেই কারণেই মৌনীকে শ্রেয় জ্ঞান করেন। হালের মার্কিন বৈচারিক (সাতজন সাম্প্রতিক মার্কিন দার্শনিকের গোষ্ঠী। গোষ্ঠী হিসেবে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতোই, যদিও এঁরা নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে খণ্ডন করেন। দলে সাণ্টায়ানা, ড্রেক, ইত্যাদি) বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল তাই বলেন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর মূল দৌর্বল্য এখানে। এবং দুর্বলতার কারণ এক ভ্রান্ত মতবাদ থেকে তাঁরা দর্শন সুরু করেছেন। তাঁরা ভাবেন জ্ঞানের সময় বস্তুর সঙ্গে চেতনার সাক্ষাৎ সম্পর্ক; একথা মনে করেন বলেই মানতে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্তকে। কিন্তু তারপর মুশকিল হয় বহির্বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্ক নির্ণয় নিয়ে।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী তাই ইন্দ্রিয়োপাত্তর কথা বর্জন

করতে চান। ইন্দ্রিয়োপাত্ত মানবার বিরুদ্ধে এঁদের আপত্তি একাধিক। প্রথমত যদি মানতেই হয় যে জ্ঞানের সময় বস্তুর সঙ্গে চেতনার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটে তা হলে স্বীকার করতে হবে যে বস্তু তখন চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে, চেতনার অন্তর্গত হয়, চেতনার অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু তা হলে একই বস্তুকে দুজন মানুষ একই সঙ্গে দেখতে পায় কেমন করে? কি করে একাই বস্তু বিভিন্ন চেতনার অঙ্গীভূত হতে পারে? দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের কথা ধরা যাক। বিজ্ঞান কখনো মানতে রাজি নয় যে বস্তুর সঙ্গে চেতনার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। যে নক্ষত্র লক্ষ মাইল দূরে তার সংবাদ যখন চেতনায় এসে পৌঁছোয় তখনই তার জ্ঞান হয়। তাই চেতনার সঙ্গে নক্ষত্রের পরিচয় সাক্ষাৎ নয়। নক্ষত্রপ্রেরিত সংবাদের সঙ্গেই চেতনার সাক্ষাৎ পরিচয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের বেলাতেই কি এক কথা নয়? তৃতীয়ত একই বস্তুর ত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হতে পারে। সুস্থ চোখ যে জিনিষকে 'নীল' দেখে, অসুস্থ চোখ তাকেই দেখতে পারে 'সবুজ'। বর্ণান্ধদের ক্ষেত্রে এমন তো প্রায়ই ঘটে থাকে। এসব উদাহরণের বেলায় যদি মানতেই হয় যে চেতনার সঙ্গে যার সাক্ষাৎ সম্পর্ক সে জিনিস বহির্বস্তু, তা হলে ত স্বীকার করতে হবে বস্তুটিতে 'নীল' এবং 'সবুজ' উভয় বর্ণই বর্তমান।

কিন্তু নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর কথা স্বীকার করা যায় না বলে, যে বিজ্ঞানবাদীর কথাই মেনে নিতে হবে তারও কোনো মানে নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় বহির্বস্তু নয় বলেই মানসিক ধারণামাত্র হতে বাধ্য নয়। যখন ফুট তিনেক ব্যাসের একটা গোল চাকা এ-বাড়ি ও-বাড়ির মাঝামাঝি গড়িয়ে চলেছে দেখতে পাই তখন যাকে দেখি তা নিশ্চয়ই মনের ধারণা নয়। মনের ধারণা গোল হতে পারে না, চাকার মত গড়িয়ে চলতে

পারে না, তার ব্যাস ফুট তিনেক বা তার অবস্থান এ-বাড়ি ও-বাড়ির মাঝামাঝি—এসব কথা হাস্যকর। ফলে যা জানি তা নিশ্চয়ই মনের ধারণা নয়। তাই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ অস্বীকার করলেই যে বিজ্ঞানবাদে ফিরতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু তাহলে? উত্তরে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এক অতিজটিল সমাধানের নির্দেশ করেছেন। বহির্বস্তু মানবমনে একরকম প্রভাব প্রেরণা করে। এই প্রভাবকে আশ্রয় করেই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব। জ্ঞাতা যে জিনিসকে সোজাসুজি জানে সে জিনিস বহির্বস্তুও নয়, মনের ধারণাও নয়; বহির্বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া প্রভাবমাত্র। এই প্রভাবগুলিকে গ্রহণ করবার পর মানুষ বহির্জগতে এদের বাস্তব উৎস কল্পনা করে নেয়; সে কল্পনা যেখানে যথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে সত্য, যেখানে অযথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে ভ্রান্ত।

এ মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে অনেক সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই: প্রতিবিম্ববাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এর পার্থক্য কতটুকু? তথাকথিত বহির্বস্তু এ মতবাদ অনুসারে অনিবার্যভাবেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নয় কি? তাহলে তার সত্তাই বা কেমন করে স্বীকার্য? প্রত্যক্ষ কোথায় যথার্থ কোথায় অযথার্থ তারই বা বিচার হবে কেমন করে? এই ধরণের নানান রকম সংশয়।

আধুনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপদটা গুরুতর। আজকের দার্শনিক দেখলেন বিজ্ঞানী মনের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদের অসহ্য অসঙ্গতি। তাই বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রাণ-পণ প্রচেষ্টা; কিন্তু মুক্তির আশায় তাঁরা যেদিকেই অগ্রসর হতে যান দেখেন পথ বন্ধ। বিচার-বিতর্ক তাঁরা অনেক করলেন, এমন কি

অনেক মার্জিত কট্‌ক্তিও। কিন্তু তারপর? নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আবিষ্কার করলেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত, বললেন, এ হল খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিচারে পাওয়া অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ নিছক বহির্বস্তু।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের কথাতেও বিপদ কম নয়। সে বিপদ হৃদয়ঙ্গম করলেন বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা; তাঁরা দেখলেন জ্ঞানের সময় ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে মানবমনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটে এ দাবি করতে গেলে শেষ পর্যন্ত মানতেই হয় এ ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি জ্ঞান-রাজ্যের একেবারে অন্তর্গত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, তখন আর সেগুলি অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ বহির্বস্তু থাকে না, এমন কি বার্কলির আইডিয়ার সঙ্গে এদের প্রভেদ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীরা বস্তুপ্রেরিত প্রভাবের কথা বলেন। কিন্তু সে-কথাতেও নানান হাঙ্গামার মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুতর তা হল এই প্রভাবগুলির স্বরূপ নির্ণয়। এই স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা নানান রকম জটিল ও দুরূহ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু জটিলতা দিয়ে দুর্বলতা ঢাকা যায় না। তাই দেখা যায় এঁরাও শেষ পর্যন্ত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ভুলে গিয়ে বিজ্ঞানবাদী প্লেটোর পদানুসরণ করেছেন। উদাহরণ সাণ্টায়ানা: প্রত্যক্ষের সময় মানবমন যার সাক্ষাৎ পরিচয় পায় তার বর্ণনা করতে গিয়ে সাণ্টায়ান প্লেটোর আইডস গুলিকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন। এগুলি আর কিছুই নয়, ভাসমান সামান্যলক্ষণ, অনাদি অনন্তকাল থেকে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভ্রাম্যমান মানবমন যখন এদের সংস্পর্শে আসে তখনই প্রত্যক্ষের জন্ম।

চরম বিজ্ঞানের যুগে এত তোড়জোড় করে বিজ্ঞানবাদকে যে খণ্ডন করবার চেষ্টা করা হল তাও কি না শেষ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদেই পরিসমাপ্ত!

প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌ম্‌ ও উইলিয়ম জেম্‌স্‌

জার্মানিতে কবরে যাবার পর, জেম্‌স্‌ বললেন, ইংলণ্ডে হেগেলের পুনরুজ্জীবন দেখে অবাক লাগে। খৃষ্টধর্মের বিকাশে তাঁর দর্শনের প্রভাব আছে বলে সন্দেহ হয়। এই ধর্ম একরকম দার্শনিক মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করবার অপেক্ষায় ছিল। হেগেল সেই মেরুদণ্ডের জোগান দিয়েছেন। তবু, এ দর্শন মূলে এত নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ যে কোনমতেই টিঁকতে পারবে না।

প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌মের মূল প্রেরণা এই 'নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ' হেগেলদর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হেগেল, ফলে হালের ব্রহ্মবাদীর দলও, বুদ্ধিবাদেরই চরম পরিণতি। জেম্‌স্‌ তাই আক্রমণ শুরু করলেন মূল বুদ্ধিবাদকে। বহু দিন, বহু দীর্ঘ দিন ধরে দার্শনিক-মহলে হেগেল একজাতের মারাত্মক সংক্রামক রোগ ছড়িয়েছেন, সে রোগ বুদ্ধিবাদের রোগ। কিন্তু বুদ্ধিবাদ বড় জোর কল্পনার মহাব্যোমে পক্ষবিস্তারের তৃপ্তি জোগায়। পৃথিবী থেকে, বিশ্বের মূর্ত রূপ থেকে, অনেক দূরের কথায় মানুষের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সত্যি বলতে শেষ পর্যন্ত এতে তৃপ্তি পেতে পারে শুধু মুষ্টিমেয় শৌখিন মানুষ, যাদের কাছে দর্শন বিলাসমাত্র। যে লোক কাজের লোক, দুনিয়ার কথা সে বাদ দেবে কেমন করে? কেমন করে বুদ্ধিবাদ ও ব্রহ্মবাদের ফাঁপা অর্থহীন শব্দে পাবে তৃপ্তি? কেমন করে সাড়া দেবে এলোমেলো খামখেয়ালের কথায়? অথচ বুদ্ধিবাদ এর চেয়ে বেশি কিছু জোগাতে পারে না। জেম্‌স্‌ লাইবনিৎসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ যে তাঁর ছিল না তা নয়, তবুও

বুদ্ধিবাদের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন বলেই এক বিশুদ্ধ, তবু অর্থহীন, জগতের কথায় তিনি মশগুল। খেলোমির চূড়ান্ত দেখবার সখ যদি আপনার থাকে তা হলে লাইব্‌নিৎসের "থিওডিসি" খানা একবার পড়ে দেখবেন। মানুষের কাছে ঈশ্বরের কাজের জবাবদিহি সে বইতে খুঁজে পাওয়া যাবে; সে বইতে প্রমান করা হয়েছে এই দুনিয়াই সেরা দুনিয়া!

এই অন্তসারশূন্য বাক্যবুদ্‌বুদ্‌ থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখাতে চান উইলিয়ম জেম্‌স্‌। সে পথ প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌মের পথ। তাই বলে প্রাগ্‌-ম্যাটিস্‌মকে কোনো বাঁধাধরা বিশ্বদৃষ্টি বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এ ঠিক দার্শনিক মতবাদ নয়; দার্শনিক পদ্ধতিমাত্র।

দর্শনের সমস্যা সমাধান কেমন ভাবে করতে হবে? কী তার পদ্ধতি? উত্তরে জেম্‌স্‌ বলেন, হিসেব করে দেখতে মানুষের কর্মক্ষেত্রে কোন্‌ ধারণার কতখানি প্রভাব। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণার মধ্যে যার প্রভাব বেশি, তাকেই মেনে নিতে হবে। আর যদি কোনোটিরই কোনো প্রভাব না থাকে তা হলে বলতে হবে যে, যে সমস্যার সমাধানে উক্ত দুটি ধারণার আগ্রহ সে সমস্যাটাই অর্থহীন। তা নিয়ে তর্ক বৃথা। একটা বিশেষ বিশ্বদৃষ্টিকে মেনে নিলে যদি দেখা যায় ব্যবহারিক জীবনে, কাজের ক্ষেত্রে, সুবিধে অনেক তা হলেই বলব সে ধারণা ঠিক, নইলে নয়। ভেবে দেখতে হবে ব্যবহারিক লাভ-লোকসানের হিসেবে কোন্‌ মতের কতখানি নগদ মূল্য। কাজের দিকটা ভুলে গিয়ে বুদ্ধিবাদ ভাবতে চায় নিছক কথার দিক; মূল্য দেয় শব্দকে, কথাকে, অভিজ্ঞতার তারতম্যকে নয়। তাই বুদ্ধিবাদের পিছনে আদিম মানুষের মনোভাব আজও প্রচ্ছন্ন। এ মনোভাব শব্দশ্রদ্ধার মনোভাব, যার প্রকাশ আদিম মানুষের যাদুবিদ্যায়। অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত, সনাতন, প্রভৃতি শব্দের নেশায় বুদ্ধিবাদীর দৃষ্টি

আচ্ছন্ন। সে নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতে হবে; ফিরতে হবে দৈনন্দিন পৃথিবীতে, লোকায়ত লাভলোকসানের হিসেবে, মূর্ত আর বাস্তব দুনিয়ায়।

অনেক অভ্যস্ত অভিমান ছেড়ে আসতে হবে সন্দেহ নেই। দার্শনিক মহলে সবচেয়ে মারাত্মক নেশা হল শাশ্বত সত্তা আবিষ্কারের নেশা। এ নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতে হবে। চরম মূল্য, শেষ কথা, সনাতন ও পরম সত্য—এ-সবের সন্ধান বিড়ম্বনামাত্র। আজ যে মতবাদে কাজের সুবিধে হয় সে মতবাদই আজ সত্য। তাই বলে অতীতের পৃথিবীতেও যে তা সত্য ছিল এমন কথা জোর করে বলা চলে না; ভবিষ্যতের মানুষও বাধ্য নয় এ মতবাদ আঁকড়ে ধরে থাকতে। কাল যদি দেখি অন্য কোনো মতবাদকে আশ্রয় করে কাজ চলছে আরও ভালো, তা হলে কাল সেই নতুন মতবাদকেই সত্যি বলে মানব। এই মনোভাবের সফল দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানে। যে মতবাদের নির্ভরে আজ গবেষণার সুবিধে সবচেয়ে বেশি, দেখা গেল সেই মতবাদই আজ বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মানলেন। অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যেদিন দেখা যাবে ও পুরোনো মতবাদ আর কাজে লাগছে না, সেদিনই বৈজ্ঞানিক জীর্ণ বস্ত্রের মতো তাকে পরিত্যাগ করবেন, খুঁজবেন নতুন সত্য। তা না হলে বিজ্ঞানে অগ্রগতি বলে কিছু থাকত না, থাকত না প্রাণ। একমাত্র পেশাদার দার্শনিকই মৃতের মোহ কাটাতে চান না, আঁকড়ে ধরতে চান স্থবিরকে, শান্তি খোঁজেন শাশ্বত সত্যের অন্ধকূপে। এ দেখে কাজের মানুষ তো হাসবেই। দিনের পর দিন তার অভিজ্ঞতা যত পরিণত হয় ততই সে বোঝে জ্ঞান তার বেড়ে চলেছে।

জেমস্ কি তা হলে ইন্দ্রিয়বাদের পুনপ্রবর্তন চাইছেন? কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। ইন্দ্রিয়বাদকে পুরোপুরি না মানলেও তার

প্রতি পক্ষপাত স্পষ্ট। প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌ম্‌ চায় অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে দার্শনিক মতবাদের নগদ মূল্য মাপতে, শুদ্ধবুদ্ধির মিনার থেকে ধুলোর পৃথিবীতে নেমে আসতে—ইন্দ্রিয়বাদের দিকে পক্ষপাত আছে বই কি! জেম্‌স্‌ নিজেই স্বীকার করেন যে ইন্দ্রিয়বাদের যা কিছু সার কথা তা তিনি আত্মসাৎ করতে চান। তবুও একে ইন্দ্রিয়বাদের নিছক পুনরুক্তি বললেও ভুল করা হবে। কারণ ইন্দ্রিয়বাদকে সোজাসুজি মেনে নেওয়া দূরের কথা, ইন্দ্রিয়বাদের অনেক আনুষঙ্গিক দাবির বিরুদ্ধে প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌মের আপত্তিও কম নয়। প্রথমত ইন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে জড়বাদের সম্পর্ক বড় বেশি ঘনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়বাদ তাই শেষ পর্যন্ত ধর্ম আর সুনীতিকে উচিত মূল্য দিতে পারে না। অথচ ধর্মের কথায় বুদ্ধিবাদীর উৎসাহ অত বেশি হলেও, ধর্মের একেবারে কিছুই যে মূল্য নেই তাই বা প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌ম্‌ মানবে কেমন করে? যুগে যুগে তো দেখা গিয়েছে কত মহৎ কাজের প্রেরণা এসেছে ধর্মের কাছ থেকে; ব্যবহারিক মূল্য তাই তার একেবারে শূন্য হতে পারে না। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে প্রাগ্‌ম্যাটিস্‌মের যেটা প্রধান আপত্তি তা হল মনস্তত্ত্বের দিক থেকে। ইন্দ্রিয়বাদ, অন্তত লক-বার্কলি-হিউমের ইন্দ্রিয়-বাদ, এক মিথ্যা মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং ভিত্তিতে ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব থাকার ফলাফল অতি শোচনীয়। কারণ, প্রাগ্‌ম্যাটিক মনে করেন দর্শনের আসল ভিত্তি মনস্তত্ত্বই।

দর্শনের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক পরিষ্কার করতে হবে। প্রাগ্‌ম্যাটিক মনে করেন দার্শনিকদের মনের গড়ন বরাবর দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ একজন বিশেষ ব্যক্তি কেন যে একরকম বিশেষ দর্শনের পক্ষপাতী তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে তার ব্যক্তিগত মেজাজে। এবং দার্শনিকের মেজাজ যেহেতু মোটামুটি দুরকম, কোমল আর কঠোর, জেম্‌স্‌ প্রচলিত

দার্শনিক মতবাদগুলিকেও দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম হল বুদ্ধিবাদী, সুখবাদী, ধর্মমোহী ইত্যাদি জাতের দার্শনিক; এবং দ্বিতীয় হল ইন্দ্রিয়বাদী, দুঃখবাদী, জড়বাদী, ধর্মদ্রোহী, ইত্যাদি জাতের দার্শনিক। আপত্তি উঠতে পারে যে দর্শনের ইতিহাসকে এ ভাবে কোমল-কঠোর মেজাজের সংঘর্ষ বলে বর্ণনা করা পরিহাস মাত্র। উত্তরে জেমস্ শুধু বলতে চান যে এ বর্ণনা যত স্থূল আর এলোমেলোই লাগুক না কেন, এ হল একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য। মানুষের মেজাজ তার দর্শনের উপর প্রভাব চিরদিনই বিস্তার করেছে, এবং করবেও। খুঁটিনাটির কথা অবশ্য আলাদা; কিন্তু মোটামুটি কাঠামোর দিক থেকে দর্শন বরাবরই দার্শনিকের মেজাজের উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

আর তাই যদি হয়, মনস্তত্ত্বের উপরই যদি দর্শনের প্রতিষ্ঠা হতে বাধ্য হয়, তাহলে ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের কাছে হাত পেতে ইন্দ্রিয়বাদ সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করে বসেছে। ইন্দ্রিয়বাদ যে মনস্তত্ত্বকে আশ্রয় করে তার নাম দেওয়া হয় 'পরমাণু-বিচারী মনস্তত্ত্ব'। এই মতে, প্রত্যক্ষের সময় মনে কয়েকটি খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়-সংবেদনার উদয় হয়। পরমাণুর মতই প্রত্যেকটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এই বেদনাগুলির সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছুলে পর জন্মায় কয়েকটি 'ধারণা'। এবং সেই ধারণাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের মন সৃষ্টি করে 'জ্ঞান'। একটা উদাহরণ ধরা যায়: 'সামনে টেবিল রয়েছে' বলে জ্ঞান হবার সময় প্রথমত মনে জন্মায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সংবেদন—রঙ, স্পর্শ, আকার, ইত্যাদির বেদনা। এই বেদনাগুলি মস্তিষ্কে পৌঁছে পরিণত হয় কয়েকটি ধারণায়—রঙের ধারণা, স্পর্শের ধারণা, আকারের ধারণা, ইত্যাদি। এই সব ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মন 'টেবিল' বলে আর-একটা ধারণার সৃষ্টি করে; এবং ক্রমশ এই ভাবেই জ্ঞান জন্মায় 'সামনে টেবিল রয়েছে'। এ মনস্তত্ত্বকে পরমাণু

বিচারী বলা হয়, কারণ জ্ঞান জিনিসটে এখানে কয়েকটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরমাণুজাতীয় প্রাথমিক সংবেদনার ফল। এ ধরনের মনস্তত্ত্ব থেকে যে হিউমের চরম বিজ্ঞানবাদ এসে পড়বে তা তো স্পষ্টই। সে বিজ্ঞানবাদকে যাচাই করে দেখতে হলে প্রথম বিচার করতে হবে এর মূল মনস্তত্ত্বটা কতখানি মানা সম্ভব।

জেম্‌স্‌ তাই এই মনস্তত্ত্বকে বিচার করে দেখাতে চাইলেন যে এর আগাগোড়াই ভ্রান্তিতে ভরা। মনের অভিজ্ঞতা পরমাণুর মতো খণ্ড বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরের কথা, নদীর স্রোতের মতোই তা অখণ্ড। বিক্ষিপ্ত ধারণা আসলে তার মধ্যে কোথাও নেই; কেবল কাজের সুবিধের জন্যে সেই অখণ্ড অভিজ্ঞতাপ্রবাহকে মানুষ ভেঙে ভেঙে বিক্ষিপ্তভাবে দেখতে চায়। মনের আসল কাজ বিশ্লেষণ—অখণ্ড অভিজ্ঞতা-প্রবাহকে অবাস্তব অভিজ্ঞতা-পরমাণুতে ভেঙে দেখা। এ কাজ অবশ্য অহেতুক নয়; কারণ ও-ভাবে ভেঙে না নিলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন একেবারে অচল। নদীর স্রোতের মতো অনন্তপরিবর্তনশীল ও প্রবহমান অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ কাজ চালাবে কেমন করে? কাজের সুবিধের জন্যে দরকার উদ্‌বর্তন, দরকার পুনরুল্লেখ। স্রোতের মধ্যে যে আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু নেই; অথচ আঁকড়ে না ধরলে কাজ চলে না। মন আমাদের ব্যবসায়ী, অভিজ্ঞতা-প্রবাহের মধ্যে তাই পুনরুক্তি খোঁজে। এবং পুনরুক্তির সাক্ষাৎ না পেয়ে পুনরুক্তির কল্পনা করে নেয়। এই কল্পিত পুনরুক্তির নির্ভরেই জীবনের ব্যবসায়ী দিক বজায় রাখে।

মানসিক ক্রিয়াকলাপের পিছনে তাই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাসনা বা ইচ্ছা। বাসনার বশে মানুষ মনে মনে কয়েকটি বিশ্বাস সৃষ্টি করে, সেই সব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই জীবনে খোঁজে সার্থকতা। কিন্তু, প্রশ্ন উঠতে পারে, দুটি বিরোধী বিশ্বাসের সম্মুখীন হলে মানুষ

করবে কী? উত্তরে প্রাগ্‌ম্যাটিক নিসংকোচে বলেন যে, যে বিশ্বাসে সবচেয়ে বেশি কাজের সুবিধে হয় তাকেই সত্যি বলে স্বীকার করতে হবে। আর কাজের সুবিধে কে কতখানি দিচ্ছে তার একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাবে অভিজ্ঞতার জবানবন্দী থেকে। প্রত্যেক মানুষই মনে মনে ভাবতে পারে তার বিশ্বাসই সবচেয়ে সেরা। বৃথাতর্ক করে মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজের ক্ষেত্রে কার নগদ মূল্য সবচেয়ে বেশি তাই হিসেব করা দরকার। তার উপরেই নির্ভর করে সত্য।

পূর্বপক্ষ হিসেবে 'সত্য' সম্বন্ধে দুটি প্রসিদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে নিতে হয়। প্রথমত, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকের দল বলেন, 'সত্য' নির্ভর করে বস্তুর সঙ্গে মানসিক ধারণার সাদৃশ্যের উপর। রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান সত্য, কারণ মনের ধারণার সঙ্গে বাইরের বস্তুর মিল আছে; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, কারণ মনের ধারণার সঙ্গে বাইরের বস্তুর মিল এখানে নেই। এ মতের সমালোচনা করে প্রাগ্‌ম্যাটিক বলেন, মনের ধারণার সঙ্গে বহির্বস্তুর মিল সত্যি আছে কিনা কেমন করে বোঝা যাবে? একদিকে নিছক বহির্বস্তু আর একদিকে নিছক ধারণাকে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বহির্বস্তুকে নিছক বহির্বস্তু হিসেবে পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা কেবল বহির্বস্তু সম্বন্ধে ধারণা। ফলে মিলিয়ে দেখা না-দেখার কথাই তো ওঠে না।

বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা উক্ত মিল-অমিলের কথায় জোর দেন না; কিন্তু তাঁরাও 'সত্যে'র যে বর্ণনা করেন তাও সমান ভ্রান্ত। মনের একটি ধারণার সঙ্গে অন্যান্য ধারণার সংগতি যদি থাকে তা হলেই সে ধারণা সত্য হবে; নইলে নয়। সংগীতের মেলায় নানান যন্ত্রের মধ্যে একটা যন্ত্র হঠাৎ বেসুরো বেজে উঠলে

সেটাকে বর্জন করা দরকার। সত্যের বেলাতেও ঠিক তাই। যে বিশ্বাস অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে বেসুরো, তাকে বর্জন করতে হবে। এ মতের সমালোচনায় প্রাগ্ম্যাটিস্‌ম্‌ বলে, সংহতিকেও সত্যের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা যায় না। কল্পনায় এমন জগৎ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে যেখানে সংহতির চূড়ান্ত। যেমন রূপকথার রাজত্ব। সেখানের রাজপুত্রের সঙ্গে তার পক্ষীরাজ, কোটালপুত্র, ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর পুরো মিল। কিন্তু 'সত্য' কোথায়?

এই ধরনের সমালোচনার উপর নির্ভর করেই প্রাগ্ম্যাটিস্‌ম্‌ বলতে চায় যে, সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের কোনোটিই গ্রাহ্য নয়। অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা ব্যবহারিক লাভ-লোকসানকেই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায় বলে ধরতে হবে। তাহলে মানতেই হবে যে বহির্জগতে, মানব-অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে, পরমসত্তা বলে কোনো কিছুই নেই; কিম্বা, যদিই বা থাকে, তাহলেও তার সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার মানুষের নেই। জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে যতটুকু পড়ে, যতটুকু নিয়ে আলোচনার অধিকার দার্শনিকের আছে, তার সবটুকুই মানব-অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী। কেননা অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই সত্যের একমাত্র বিচার, অভিজ্ঞতার তারতম্যই সত্যকে ভাঙে গড়ে।

অবশ্যই পাঠকের কাছে বাধা লাগবার কথা; প্রচলিত দর্শনের অবাস্তবতা নিয়ে অত আড়ম্বরের পরও কি না বিংশ শতাব্দীর ধুরন্ধর কর্মকুশলীর দল বিজ্ঞানবাদেরই ফাঁদে পড়লেন! লাইব্‌-নিৎস্‌-হেগেল নিয়ে এত যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তার মূল কারণ তো এই যে, তাঁরা বিজ্ঞানবাদী। বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে জাতিভেদ ও প্রবৃত্তিভেদ অবশ্যই আছে—কেউ বা বলেন পরমসত্তা ব্যক্তিগত মনের উপর নির্ভর করে, কেউ বা বলেন পরমেশ্বরের মনের উপর; কারও বা

ধর্মের দিকে ঝোঁক বেশি কারও বা কম। কিন্তু মূর যেমন দেখিয়েছেন, এই সব তফাৎগুলো শেষ পর্যন্ত বড় কথা নয়। এই সব খুঁটিনাটির তফাৎগুলো বিজ্ঞানবাদের উপসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়—কোথাও বা উপসিদ্ধান্ত নির্ণয়ের মধ্যে নৈয়ায়িক অনিবার্যতা আঁটসাঁট, কোথাও বা ঢিলেঢালা। আসল কথা হল বিজ্ঞানবাদের মূল দাবি—সত্তামাত্রেই অভিজ্ঞতানির্ভর। হালের কর্মকুশলী দার্শনিকের দলও তাই পাঠকের কাছে ধাঁধা বিশেষ : একদিকে বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অসহ্য আপত্তি এবং অপরদিকে সেই বিজ্ঞানবাদের কাছেই প্রচ্ছন্ন সমর্পণ।

বের্গসঁ

বুদ্ধি জিনিসটে, বের্গসঁ বললেন, বস্তুর চারপাশে ঘুরপাকে খেয়ে তথ্য জোটাতে পারে অনেক, কিন্তু তত্ত্বে অধিকার তার নেই। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সে বস্তুকে দেখতে চায়, নানান ভাষায় তর্জমা করতে চায় তাকে, নানান প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে চায় বস্তুর মূল রহস্য। কিন্তু এ ভাবে আসল খবর জুটবে কেমন করে? বুদ্ধির সমস্ত তথ্যই যে আপেক্ষিক; বিশেষ দৃষ্টিকোণের উপর, বিশেষ প্রতীকের উপর, বিশেষ ভাষার উপর সে নির্ভর করতে বাধ্য। নানান উপমার সাহায্যে বের্গসঁ কথাটা প্রকাশ করতে চান। ধরা যাক উপন্যাসে বর্ণিত কোনো চরিত্রের কথা : লেখক তার অজস্র বর্ণনা দিচ্ছেন, অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ফেলে তাকে দেখাচ্ছেন, অজস্র কথাবার্তা বসিয়েছেন তার মুখে। কিন্তু এ ভাবে, তালিকা যত দীর্ঘই করা হোক-না কেন, সে চরিত্রের আসল কথা কতটুকু জানা যেতে পারে? তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে পাঠক যদি একবার নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পারেন তা হলে। কিম্বা, অজস্র ছবি বা আলোকচিত্রের সাহায্যে কোনো শহরের আসল খবর, যে খবর পাওয়া যায় সে-শহরে বাস করে, পাওয়া কি সম্ভব? যে ব্যক্তি গ্রীক জানেন না তিনি কি সহস্র তর্জমার মারফৎও হোমরের মূল রস আস্বাদ করতে পারেন? তর্জমাই হোক, প্রতীকই হোক, বস্তুর মূল তত্ত্ব এ পথে আসতে পারে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধি তাই অপ্রতিষ্ঠ, দৃষ্টিকোণ বৈষম্যের উপর তার নির্ভর। তা ছাড়াও, কয়েকটি ধারণার সাহায্যেই বুদ্ধি

বস্তুকে বুঝতে চায়। কিন্তু বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণার মধ্যে ধরা পড়বে কেমন করে? কারণ ধারণা খোঁজে সামান্যলক্ষণ। অর্থাৎ যে বস্তুর বর্ণনার জন্যে ধারণাটির প্রয়োগ তার বর্ণনা ছাড়াও আরও সমস্ত সদৃশ-বস্তুকে সে বর্ণনা করে বসে। যখন বলি 'একটা টেবিল দেখছি' তখন টেবিল শব্দে সামনের বিশেষ বস্তুটির কথাই বলতে চাই, অথচ এই বিশেষ বস্তুটি ছাড়াও অন্য সহস্র টেবিল সম্বন্ধেই এ শব্দের প্রয়োগ। অর্থাৎ বিষয়ের মূর্ত ও বিশেষ রূপ বর্ণনা না করে, বিষয়ের আসল খবরটা না দিয়ে, বুদ্ধির ধারণা এমন কথা বলতে চায় যা অন্যান্য আরও নানান বিষয়ে বর্তমান। বের্গসঁ তাই বিদ্রূপ করে বলছেন, বুদ্ধির ধারণা যেন দোকানের তৈরি জামা, এর গায়েও লাগে, ওর গায়েও লাগে, অমন হাজার লোকের গায়ে লাগে, কিন্তু ঠিকমত লাগে না কারও গায়েই।

বিশুদ্ধ বুদ্ধির মূল্য খণ্ডন করলেও বের্গসঁ কিন্তু প্রাগ্‌ম্যাটিকদের পথ ধরতে মোটেই রাজি নন। কারণ প্রাগ্‌ম্যাটিকদের মতে বুদ্ধির গ্লানি থেকে নিষ্কৃতির পথ ক্রিয়া বা ব্যবহারের মানদণ্ড; অথচ বের্গসঁ বলেন বুদ্ধির মূলে এত ভ্রান্তি কেননা বুদ্ধি ব্যবহার বা ক্রিয়ারই দাস। অনাসক্ত জ্ঞানে তার স্পৃহা নেই, জানবার খাতিরেই জানতে সে চায় না। লাভ-লোকসানের হিসেব নিয়ে বুদ্ধি ব্যস্ত; জানতে সে চায় না, চায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। বুদ্ধির কোনো ধারণা জিনিসটার উপর চাপাবার সময় আমরা শুধু ভাবি জিনিসটা ঠিক কোন্ দলের, আমাদের ঠিক কোন্ কাজে লাগতে পারে, আমরা ঠিক কী করতে পারি জিনিসটা নিয়ে। বস্তুর গায়ে একটা ধারণার ছাপ লাগিয়ে দেওয়া মানেই ঠিক করে রাখা কোন ধরনের কাজের পক্ষে বস্তুটা উপযোগী।

ক্রমবিকাশের দিক থেকে ভেবে দেখলে কথাটা আরও পরিষ্কার

হয়। জীবের ক্রমবিকাশ মানুষে এসে ঠেকেছে, এবং এ ইতিহাস আলোচনা করলে ধরা পড়ে ক্রমশ জটিল, ক্রমশ সূক্ষ্ম ভাবে প্রত্যেক পদে জীবের চেতনা চেয়েছে পারিপার্শিকের সঙ্গে নিখুঁত সম্বন্ধ প্রবর্তনের। ক্রমবিকাশের ইতিহাস যখন মানুষে এসে ঠেকল তখন দেখা গেল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষ শ্রেষ্ঠ সঙ্গতি রাখতে শিখেছে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থতায়। বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের দেহ এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিখুঁত সঙ্গতি আনা। তাই ক্রমবিকাশের প্রকৃত রূপ বুদ্ধি দিয়ে ব্যক্ত করাও অসম্ভব। জীবন যাকে সৃষ্টি করেছে, জীবনের মূল রহস্য সে বোঝাবে কেমন করে? যে নুড়ি ঢেউয়ের ধাক্কায় সমুদ্রবেলায় এল সে নুড়ি কি ঢেউয়ের রহস্য বলতে পারে? বুদ্ধির বাঁধা ছাঁচে পরম-সত্তাকে ঢালবার সমস্ত চেষ্টা তাই ব্যর্থ। ছাঁচগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়, জীবনকে ধরে রাখার পক্ষে বড় সংকীর্ণ এসব ছাঁচ।

কাণ্টও তাঁর 'শুদ্ধবুদ্ধির বিচারে' দেখাতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধি দিয়ে পরমতত্ত্বকে জানা যায় না। তবে কাণ্টের যুক্তি অন্য—তিনি প্রধানতই দেখাকে চান যে, শুদ্ধবুদ্ধি পরমতত্ত্বের অন্বেষণে অগ্রসর হলে দ্বন্দ্বমূলক বিরুদ্ধ ধারণাঁর গোলকধাঁধায় গিয়ে পড়ে। এবং বুদ্ধিই যখন এভাবে বিপর্যস্ত, তখন আর পরমসত্তাকে জানবার কোনো উপায়ই মানুষের আওতায় নেই। বস্তুসত্তা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, দর্শন সম্ভব নয় কোনোদিন। কাণ্টোত্তর দার্শনিকদের প্রধান সমস্যা দর্শনকে এই কাণ্টীয় শক্তিশেল থেকে বাঁচানো। হেগেল পথ খুঁজলেন এক নব্যন্যায়ের আবিষ্কারে: দ্বন্দ্বমূলক বিরুদ্ধধারণার মধ্যে পড়লেই যে হাল ছাড়তে হবে তার কোনো মানে নেই, কারণ মানববুদ্ধি এ দ্বন্দ্বের সমন্বয় করতেও জানে। কাণ্ট থেকে নিষ্কৃতির এ পথ বের্গসঁর মনঃপূত নয়। তাঁর মতে বুদ্ধি দিয়ে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অনর্থক,

তা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই শুদ্ধবুদ্ধি কোনো অবস্থার মধ্যে কোনো ভাবেই পরমসত্তার সন্ধান পেতে পারে না। কান্টের এ প্রতিজ্ঞা বের্গসঁ মেনে নেন। কিন্তু তাই বলে এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুমাত্রের কাথাই দর্শনের শেষ কথা নয়। বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না বলে জানবার কোনো পথই নেই, তাই বা কেন মানতে হবে? ' বস্তুত বুদ্ধিই মানব-মনের একমাত্র বৃত্তি নয়। বের্গসঁ আর এক বৃত্তির কথা বলেন, তার নাম স্বজ্ঞা। বুদ্ধি বস্তুর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে ভ্রান্ত তথ্যে ঝুলি বোঝাই করে, স্বজ্ঞার প্রবেশ তত্ত্বের অন্দরমহলে। বুদ্ধি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে, নানান প্রতীকের সাহায্যে বস্তুর নানান রকম তর্জমা করতে চায়; স্বজ্ঞা বস্তুকে জানতে পারে একেবারে পরিপূর্ণভাবে, একেবারে সাক্ষাৎভাবে, সমগ্রভাবে। স্বজ্ঞার সাহায্যে মানবমন বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়, বস্তুর প্রাণ-স্পন্দনের সাড়া পায়। উপন্যাসের যে চরিত্র হাজার বর্ণনা সত্ত্বেও অজ্ঞাত রইল তাকে জানা যাবে সহানুভূতির জোরে, পাঠক একবার কোনোমতে নিজেকে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলাতে যদি পারে। হোমরের হাজার তর্জমাও যে কথা বোঝাতে পারে নি, মূলগ্রন্থে একবার প্রবেশ করতে পারলে সে কথা সহজ হয়ে যাবে। অজস্র আলোকচিত্রও শহরের যে সংবাদ দিতে পারে না, একবারমাত্র সেখানে যেতে পারলে সে সংবাদ ঠিক পাওয়া যাবে। স্বজ্ঞা আর কিছুই নয় শুধু একরকম আধ্যাত্মিক সহানুভূতি—যা দিয়ে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, বস্তুর সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে ফেলা সম্ভব। বুদ্ধির বিশ্লেষণী বৃত্তির অনন্ত অশান্তি, এ অশান্তি মেটাতে বুদ্ধি দৃষ্টিকোণের তালিকা অজস্র বাড়িয়ে যায়, শুধু সংখ্যায় বাড়িয়ে অসম্পূর্ণ প্রতীককে সম্পূর্ণ করতে চায়, অপর্যাপ্ত তর্জমাকে পর্যাপ্ত করার আশা করে। এ পথে চলবার কোনো শেষ নেই, এ পথে সার্থকতা

সম্ভবই নয়। স্বজ্ঞার সরল অনাসক্ত জ্ঞান থেকে বুদ্ধির বিশ্লেষণে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব নয়, কিন্তু বিশ্লেষণকে বাড়িয়ে গিয়ে কোনমতে স্বজ্ঞায় পৌছোনো যায় না। স্বজ্ঞার দৃষ্টি অখণ্ড, বস্তুর সঙ্গে অদ্বৈত স্থাপন করে বস্তুকে সে জানে সমগ্রভাবে, অনুভব করে বস্তুর প্রাণস্পন্দন। বুদ্ধির দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন, নানান দিক থেকে বস্তুর নানান রকম প্রতীক জোগাড় করে, কিন্তু এই অজস্র প্রতীকেরও সামর্থ্য নেই বস্তুর পরিপূর্ণ রূপ গড়ে তোলবার, যদিও অখণ্ড স্বজ্ঞা থেকে পরিচ্ছিন্ন প্রতীকে প্রত্যাবর্তন অভাবনীয় নয়। কবিতাটি পড়বার পর, তাকে সমগ্রভাবে পাবার পর, অক্ষররাশির স্তূপে তাকে ভেঙে ফেলা সম্ভব; কিন্তু কবিতাটি না জেনে ভগ্ন অক্ষররাশির স্তূপ থেকে তার রূপ আবিষ্কার অসম্ভব। অক্ষরগুলি কবিতার অংশ নয়, অক্ষররাশির উপর অখণ্ড কাব্যের আবির্ভাব। কাব্যের অখণ্ড জীবন ছাড়া অক্ষরগুলির কোনো স্বতন্ত্র প্রাণ থাকতে পারে না।

বের্গসঁ বলতে চান এই স্বজ্ঞা জিনিষটে অলীক নয়, কবিকথন নয়। এর পেছুনে কোনো গূঢ় রহস্যও লুকোনো নেই। কাব্য রচনার চেষ্টা যিনি করেছেন তিনিই এর আভাষ পেয়েছেন, কাব্য আস্বাদন যিনি করেছেন তিনি জানেন এর কথা। এছাড়াও, অন্তত একজায়গায় স্বজ্ঞার নিশ্চিত স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া সম্ভব, আত্মজ্ঞানের বেলায়। আর কোনো কিছুর সঙ্গে আমরা অন্তরঙ্গ অদ্বৈত স্থাপন করতে পারি আর নাই পারি, অন্তত নিজেদের জানবার সময় এ অন্তরঙ্গতা না এনে উপায় নেই। মনকে ভিতরমুখো করে নিজেদের জানতে গেলে প্রথমত অবজ্ঞা মেলে নিশ্চল কঠিন কয়েকটি মানসিক অবস্থা—ইন্দ্রিয়বেদনা, স্মৃতি, অভ্যাস, এইরকম অনেক। কিন্তু এ তো গেল নদীর উপরের জমাট-বাঁধা বরফ। তাকে ভেঙে একটু ভিতরে উঁকি দিতে পারলে সন্ধান

সৃষ্টির নেশাতেই। কারণ সৃষ্টিই তার স্বভাব।" ক্রমবিকাশ যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশী নয়, সৃজনী।

প্রাণীতত্ত্বের থেকে এর স্বপক্ষে বের্গসঁ বহু অমূল্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রাণীতত্ত্বের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের প্রধান প্রশ্ন হল যুগে যুগে জীবদেহে বা জীবের অবয়বে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তার মূল কারণ কি? যান্ত্রিক মতে এর কারণ, কয়েকটি যান্ত্রিক যোগা-যোগ; উদ্দেশী মতে এর কারণ, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এ ভাবেই ক্রমশ চরিতার্থ হয়ে থাকে। বের্গসঁ বলেন, এর কোনোটাই ঠিক নয়, কারণ প্রাণীতত্ত্বের দৃষ্টান্তে বিপরীত সাক্ষ্য। যান্ত্রিক ক্রমবিকাশের কথাই ধরা যাক: ডারউইন প্রমুখের মতে জীবদেহের মধ্যে কয়েকটি অতি সূক্ষ্ম আপতিক পরিবর্তনের বীজ বর্তমান বলেই ক্রমবিকাশের পথে জীবের আকৃতি ও অবয়বে পরিবর্তন পরিলক্ষিত। লামার্ক প্রমুখের মতে জীবদেহ ক্রমাগত নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চায়, তাই এ পরিবর্তন। এ ধরনের সূক্ষ্ম প্রভেদ উদ্দেশী ক্রমবিকাশবাদীর স্বগোষ্ঠীতেও বর্তমান। কেউ কেউ বলেন, ক্রমবিকাশ যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চলেছে সে উদ্দেশ্য সৃষ্টির বাইরে কোথাও অবস্থান করছে, অন্যেরা বলেন, সে উদ্দেশ্য সৃষ্টির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। অথচ প্রাণীতত্ত্বের আওতায় এমন দৃষ্টান্ত যদি দেখানো যায় যে জীবন বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে, বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয় ঘটিয়ে, গড়ে তুলছে অপূর্বকে, তা হলে যান্ত্রিক মতবাদের দাবি ভেঙে পড়ে। কারণ, যান্ত্রিক ধারণার প্রধান উপজীব্য এক কারণ থেকে শুধু একজাতীয় দ্রব্যের উৎপত্তিই সম্ভব, কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণে দেখা যাবে এক জাতীয় দ্রব্য উঠছে বিভিন্ন জাতীয় কারণের যোগাযোগ থেকে। একে নিছক আপতন বলে উড়িয়ে দেওয়াও কোনো কাজের কথা নয়; দুজন লোক

এলোমেলো পথে চলতে চলতে পরস্পরের দেখা পাবে তাতে হয়ত অবাক হবার কিছু নেই; কিন্তু এলোমেলো চলার পথে একজন যে জটিল পদরেখা রেখে যায় আর একজনও যদি এলোমেলো চলার পথেই রেখে যায় একেবারে ঠিক সেই রকম পদরেখা তা হলে এ সাদৃশ্যকেও শুধু আপতন বলে মনে করা দুঃসাহস নয় কি? একে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বলাও চলে না, পরিবর্তনের কারণ যদি শুধু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই হয় তা হলে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের দরুন একই পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব? জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগাযোগের ফলেও যে একজাতীয় দ্রব্যের উদ্ভব সম্ভব বের্গসঁ তা দেখিয়েছেন অবলীলায়: মেরুদণ্ডী জীবের চোখ আর কম্বোজ-জাতীয় জীবের চোখ তিনি তুলনা করে বলছেন কী অসম্ভব রকম জটিল, অথচ কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! কম্বোজ-জাতীয় জীবের উৎপত্তি নিয়ে যত তর্কই থাক না কেন, এ কথায় কেউ সন্দেহ করতে পারেন না যে, ক্রমবিকাশের পথে চোখ ব'লে অঙ্গ ফুটে ওঠার আগেই কম্বোজ আর মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ তারা এগিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। তা হলে উভয়ের চোখের গঠনে অমন সাদৃশ্য এল কেমন করে?

প্রাণীতত্ত্বের উদাহরণ দিয়ে বের্গসঁ উদ্দেশী ক্রমবিকাশকেও খণ্ডন করতে চেয়েছেন। ক্রমবিকাশের অর্থ যদি শুধু পূর্বনির্ধারিত কোনো উদ্দেশ্যের ক্রমশ চরিতার্থতাই হত, তা হলে জীবন যত অগ্রসর হয়েছে তত সংহতি চোখে পড়া উচিত ছিল। যেমন বাড়ি তৈরির সময় কারিগর যত ইট-পাথর সাজিয়ে চলে ততই পরিষ্কার হয়ে আসে বাড়ির চেহারা। কিন্তু এ জিনিস জীবরাজ্যে চোখে পড়ে না। বরং দেখা যায় সামনে এগিয়ে চলতে চলতে সবই হঠাৎ যেন এলোমেলো হয়ে এল, কোথাও যেন পেছিয়ে-পড়া ভাব, কোথাও

পথ বদলের লক্ষণ। প্রকৃতিতে উন্নতি সরল রেখার মতো একটানা নয়; ক্রমবিকাশ একাধিক পথে পাশাপাশি চলে। তার পথে চাড়াই আছে, ওৎরাই আছে।

তাই ক্রমবিকাশের প্রচলিত কোনো ব্যাখ্যাতেই বের্গসঁর তৃপ্তি নেই। স্বাধীন প্রাণের সৃজন কোথাও ব্যক্ত হয়নি। তা হবেই বা কেমন করে? ক্রমবিকাশের প্রচলিত ব্যাখ্যামাত্রেই যে বুদ্ধিগত, বুদ্ধি প্রাণপ্রবাহের অখণ্ড রূপকে কিছুতেই ধরতে পারে না—প্রাণপ্রবাহের সমগ্রতার উপর নিজের পরিচ্ছিন্নতা বিক্ষেপ করে। সমগ্র দৃষ্টি শুধু স্বজ্ঞার। আলোকচিত্রের বেলায় যেমন সহস্র ছবিকে সমগ্রভাবে দেখলে তবেই গতির রূপ পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছবিকে পৃথক দৃষ্টিতে মনে হয় শুধু ছবি, ক্রমবিকাশের বেলাতেও ঠিক তাই—সমগ্র দৃষ্টিতে না দেখলে ক্রমবিকাশকে বুঝতে পারার কোনো উপায় নেই। অথচ মানুষ চলে ব্যবহারের তাগিদে, চিরচঞ্চল প্রবাহকে সে ব্যবহারে নিয়োগ করবে কেমন করে?—তার মধ্যে নেই পুনরাবর্তন, নেই আঁকড়ে ধরার মতো স্থায়িত্ব। এলো ভিতালকে সে তাই ভেঙে দেখতে চায়, কল্পনা করে জড়ের, জড়কে নিয়েই তার জীবনযাত্রা। কিন্তু ব্যবহারের দাবি তো আর তত্ত্বের দাবি নয়; তত্ত্বের দিক থেকে জড়ের অনুভব নেহাতই অনুভবাভাস।

জড়ের সঙ্গে 'দেশে'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, ডেকার্ট যেমন বলেছেন 'দেশ'ই জড়ের একমাত্র বিশুদ্ধ স্বরূপ। ফলে, বের্গসঁ তো বলবেনই 'দেশ' জিনিসটেও বুদ্ধির ভ্রান্ত সৃষ্টি। দর্শনের ইতিহাসে 'দেশ' ও 'কাল'কে প্রায়ই এক কোঠায় ফেলে আসা হয়েছে। কিন্তু বের্গসঁ বলতে চান এ দুয়ের তফাৎ আকাশ-পাতাল। 'কালে'র প্রকৃত রূপ বের্গসঁর মাতৃভাষায় হল 'ডিউরী'। এর যোগ্য প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর যে প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দ আছে—ডিউরেশন—তাও ডিউরীর

সম্পূর্ণ মর্ম প্রকাশ করতে পারে না, কেননা এর মধ্যে শুধু টিঁকে থাকার অর্থ নেই, ধরে রাখার ব্যঞ্জনাও আছে: বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে সমগ্র অতীত জাগ্রত—এমন কি শুধু অতীতও নয়, বর্তমান এবং অতীতের যোগফলও নয়, ভবিষ্যতের দিকে প্রতি পলে বেড়ে চলাও। এ শুধু ঘটনার পর ঘটনাকে গুছিয়ে যাওয়া নয়, ভবিষ্যতের দিকে অতীতের সমগ্র অগ্রসর। এবং এই অগ্রগতির প্রত্যেক স্তরে অভিনবের অপূর্ব আবির্ভাব!

ডিউরীর প্রধান পরিচয় স্মৃতির মধ্যে। স্মৃতির সাহায্যেই সমগ্র অতীত সজীব হয়ে ওঠে বর্তমানে। তাই বলে চলতি কথায় যেমন কোন কবিতার অক্ষররাশির উচ্চারণকেই মানুষ স্মৃতির দৃষ্টান্ত বলে মনে করে বের্গসঁ তা মানেন না। স্মৃতি যেখানে যথার্থ, সমগ্র অতীত আবেগ সেখানে পুনরুজ্জীবিত। স্মৃতির দরুনই বর্তমান নুয়ে পড়ে সমগ্র অতীতের ভারে—অবশ্যই নিছক অতীতের পুনরুক্তিতে নয়, কেননা এখানে অতীতের স্মৃতিটুকুও রয়েছে—তাই এ এক অপূর্ব আবির্ভাব। স্মৃতি তো অতীত মুহূর্তে ছিল না।

স্বজ্ঞার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বের্গসঁ যে সমষ্টি ও সমগ্রতার হেগেলীয় প্রভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন তারই উপসিদ্ধান্ত পুরুষকার সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ। বিভিন্ন অংশের যোগফলে সমষ্টিকে পাওয়া যায়, সমগ্রতাকে নয়। বিভিন্ন স্বরের যোগফল ছাড়াও সুরের সমগ্র সত্তা আছে, বর্ণমালার সমষ্টির ভিতর কাব্যরসের সন্ধান মূঢ়তামাত্র, ক্যান্‌ভাস, রঙ আর রেখার যোগফলটুকুই চিত্র নয়। বুদ্ধি সমষ্টির আভাস পায়, শুধু স্বজ্ঞার জ্ঞানেই সমগ্রতা। বুদ্ধি দিয়ে তাই পুরুষকারের প্রমাণ খোঁজা নিষ্ফল; কেননা মানুষের জীবনকে সহস্র ঘটনার যোগফল হিসেবে দেখলে তার পুরুষকারের প্রশ্নই ওঠে না: পৃথক দৃষ্টিতে তার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই সহস্র ঘটনান্তর দিয়ে

নিয়ন্ত্রিত। তবু শৃঙ্খলবাদকেই যে মানতে হবে এমন কোন কথা নেই; কেননা মানুষ তো আর খণ্ড সত্তার সমষ্টিমাত্র নয়। স্বজ্ঞার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার সমগ্র রূপ—সে রূপে অবাধ মুক্তি, শৃঙ্খলের লেশমাত্র নেই।

ধর্ম পুরুষকার-নির্ভর। বের্গসঁর এই প্রমাণ তাই বিংশ শতাব্দীতেও ধর্মের নতুন প্রতিষ্ঠা খুঁজল। তবু চলতি খৃষ্টধর্মের সঙ্গে অনেক তফাৎ: সমগ্র য়ুরোপ তো এতদিন গ্রীক সভ্যতার মোহে খৃষ্টের নামে প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদকেই পুজো দিয়েছে, এটুকু ধরতে পারে নি যে খৃষ্টের প্রকৃত বাণী স্থিতির বাণী নয়, গতির বাণী। জীবন যে অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য তার প্রকাশ খৃষ্টের পুনরুজ্জীবনে। এ বাণী গ্রীকধর্মে ছিল না, হিন্দুধর্মে ছিল না। গ্রীক ও হিন্দু স্থিতির মোহে জীবনকে অস্বীকার করতে বসেছিল। এমন কি প্লটিনাসের মতো বুদ্ধিবিতৃষ্ণ ঋষিও গতিমন্দিরের সিংহদ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন স্থিতির টানে, প্লেটোর টানে।

লাভ-লোকসানের হিসেবনিকেশে মত্ত আমাদের মন। আমাদের চোখে বুদ্ধির মেকী চশমা। জ্যামিতিক অনুপপত্তি দিয়েই হয়ত আমাদের জীবন গড়া। বের্গসঁ বলেন বুদ্ধির এই মেকী চশমাটা ভেঙে চুরে মিশমার করে ফেলে একবার শুদ্ধ স্বজ্ঞার আশ্রয়ে দাঁড়াতে। ঝিলিমিলি ঝিলামের পাশে সান্ধ্য বলাকার পক্ষধ্বনি কবিকে শুদ্ধ স্বজ্ঞার কল্পলোকে সত্যিই বুঝি নিয়ে গিয়েছিল, তাই তখন মনে হল—

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

মার্কস্‌বাদ : আজ ও আগামী কাল

দিকে দিকে আজ এক দানবের হানা, সাম্যবাদের দানব। বণিক পৃথিবীর প্রত্যেক প্রতিনিধি তার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত, পঙ্গুপ্রায় পুরোহিত থেকে সর্বশক্তি প্রহরী পর্যন্ত। আজকের দুনিয়ায় যাঁরা পেশাদার দার্শনিক তাঁরা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেমন ভাবেই হোক, বণিক-সম্প্রদায়েরই অন্নাশ্রিত : মার্কস্‌বাদ, সাম্যবাদের দর্শন, তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য ত হবেই। শুধু অগ্রাহ্য করবার পদ্ধতিটা অভিনব—নিছক অবজ্ঞা। মার্কস্‌বাদ যে আরও পাঁচরকম দায়িত্বশীল দার্শনিক মতবাদের অন্তত সমগোত্রীয় এ দাবি তো স্বতঃসিদ্ধভাবেই হাস্যকর। এমন কি খণ্ডন করবার জন্যে একে খুঁটিয়ে পড়বারও প্রয়োজন নেই : গজদন্তমিনারে গজমতি নিয়ে যাঁদের করবার কাকদন্তের মতো তুচ্ছ বস্তুকে তাঁরা পরীক্ষাই বা করতে যাবেন কেন? হেগেলের অধ্যাত্মবাদ ও ফায়ারবাকের জড়বাদের বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে মার্কস্‌পন্থী যে অস্পৃশ্যের জন্ম দিয়েছেন দর্শনের পূতমন্দিরে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অথচ ভুললে চলবে না, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞে'র হোতা এই দর্শনের কাছ থেকেই পথনির্দেশ পেয়েছিলেন, ভুললে চলবে না, পৃথিবীর ছভাগের একভাগের মানুষ তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণকে আজ সচেতনভাবে এই বিশ্বদৃষ্টির উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। তাদের আশা, তাদের বিশ্বাস, এ দর্শন পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনবে, আনবে নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজ, মানুষ মুক্তি পাবে মহাযুদ্ধের অন্ধ আবর্ত থেকে, শেষ হবে নগরের বুকে শকুনির উৎসব। হতে পারে এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, তার ভিত্তি শুধু ভ্রান্তি দিয়ে গাঁথা!

তবু আজকের পৃথিবীতে এ দর্শন এক জাগ্রত মহাশক্তি—তাই আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের আলোচনা থেকে একে বাদ দেওয়া যায় না।

বিজ্ঞানবাদকে বহুবার বহুভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। দর্শনের ইতিহাসের উপর একবার আলগোছে চোখ বোলালেই দেখতে পাওয়া যায়, কতবার! তবু বিজ্ঞানবাদ যেন গ্রীক পুরাণের সেই পাখী, নিজের ভস্মাবশেষ থেকে উঠে আসে নবীন জন্ম নিয়ে। শুধু তাই নয়, তার যেন জানা আছে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল: যাঁরা তার পরম শত্রুর মতোই তাকে খণ্ডন করতে এগিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তাঁরাই এর সংকীর্তনে চরিতার্থ। এমন নয় যে দার্শনিক হিসেবে তাঁরা দুর্বলচিত্ত। আসলে দর্শনশাস্ত্রে যাঁরা দিকপাল তাঁদেরই এই অবস্থা।

সক্রেটিসের কাছে সফিষ্টদের বিজ্ঞানবাদ অসহ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজে যে দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন করেছেন, যার পূর্ণ বিকাশ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য প্লেটোর রচনাবলীতে, তা ত বিজ্ঞানবাদেরই গৌরবোজ্জ্বল গৌরীশৃঙ্গ। বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনে আচার্য শঙ্করের উৎসাহও কম নয়। অথচ শেষ পর্যন্ত এই মূর্ত পৃথিবীকে তিনি চিৎসমুদ্রে এক অলীক মুহূর্তবুদবুদ মনে করলেন। বিজ্ঞানবাদের একেবারে চূড়ান্ত কথা। কাণ্টের বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনও দর্শনের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যে দর্শনের সূত্রপাত তিনি নিজে করলেন, যে দর্শনকে লালন করলেন ফিক্‌টে-সেলিং-হার্বার্ট-হেগেল, তার মতো সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ য়ুরোপের ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় দার্শনিকের দল একেবারে যেন মরীয়া হয়ে উঠল, ঠিক হল বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে হবে রীতিমতো দল পাকিয়ে, সভা ডেকে। দল পাকালেন প্রাগ্‌ম্যাটিকেরা, সভা ডাকলেন

নব্য আর বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা—বড় বড় নামজাদাদের সভা। কিন্তু অত আড়ম্বরের পরেও প্রাগ্ম্যাটিকদের মুখে শোনা গেল পরমসত্তা ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষণিক অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষীমাত্র। নব্য ও বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বুদ্ধির অমন চোখ ধাঁধানো জৌলুস দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত কী রকম বিজ্ঞানবাদের বিড়ম্বনায় পড়েছেন তার আভাস তো আগেই দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানবাদের অসংগতি নিয়ে দারুণ অসন্তোষ, আবার বিজ্ঞানবাদের কাছেই করুণ আত্মসমর্পণ—দর্শনের এই গোলকধাঁধা থেকে কি মুক্তি নেই? এ প্রশ্নের উত্তরেই মার্কসবাদের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রথমত, এতদিন পর্যন্ত এমনটা না হয়ে উপায়ই ছিল না। কেননা দার্শনিকেরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। অথচ শুধু বুদ্ধি দিয়ে, শুধু জ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করা যায় না। কারণটুকু স্পষ্ট: জ্ঞান বা বুদ্ধিকে সত্যের চরম বিধাতা বলে একবার স্বীকার করে নিলে বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে আর মুক্তি নেই! পরমসত্তা তো তাহলে স্বতঃসিদ্ধভাবেই মানব অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বেই! তাই দিদেরোর মতো দার্শনিককে বিরক্ত হয়ে বলতে হয়: বিজ্ঞানবাদে যদিও অসংলগ্নতার চূড়ান্ত তবুও বুদ্ধির আর দর্শনের গলায় দড়ি, এ মতবাদকে খণ্ডন করা একেবারে অসম্ভব! তাই ক্ষুরধার বুদ্ধি সত্ত্বেও রাসেলকে স্বীকার করতে হয়, যদিও এ মতবাদকে মানবার কোনো তাগিদ নেই তবুও বুদ্ধির বিচারে এর মধ্যে কোনো গ্লানি আবিষ্কার করাও সম্ভব নয়।

তর্ক যে অপ্রতিষ্ঠ, সত্যের সন্ধানে শুদ্ধবুদ্ধি যে বিভ্রান্ত, এ কথা এমন কিছু নতুন নয়। কাণ্টের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে ব্রাড্‌লি, বের্গসঁ প্রমুখ উত্তর-দার্শনিকের অনেকেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু নিষ্কৃতির যে পথনির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন তাও তো বিজ্ঞানবাদেরই পথ!

কেননা বুদ্ধির বদলে চেতনারই অন্য কোনো স্তরকে তাঁরা আঁকড়ে ধরতে চান। যেমন ব্রাড্‌লির তুরীয় অভিজ্ঞতা বা বের্গসঁর প্রজ্ঞা। ফলে চেতনার দাবিই চরম দাবি থেকে যায়।

অথচ, মার্কস্‌পন্থী বলেন, কাজের মানুষের দিকে চেয়ে দেখুন : কত সহজে, কী অনায়াসে এই দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সমাধান সে করেছে। যে গতর খাটায় সে তো প্রতি মুহূর্তে বাস্তব দুনিয়ার মুখোমুখী। এ দুনিয়ার যথার্থ্য নিয়ে বৃথা তর্কের অবসরও তার নেই। তার হাতের কঠিন মুঠোয় কাস্তে আর হাতুড়ি ; এই কাস্তে, এই হাতুড়ি বাস্তব দুনিয়ার মূর্ত বস্তু, না তারই মনের ধারণা—এমনতরো আষাঢ়ে প্রশ্ন তোলবার তার মেজাজও নেই, অবসরও নেই। বিজ্ঞানবাদের এই খণ্ডন যে নেহাত 'বালিশভাষিতম্‌' নয় তার সমর্থনে শিষ্টাচার হিসেবে বৃদ্ধসম্মতিরও উল্লেখ করা যায়। ডাঃ জনসন একবার পাথরের উপর পদাঘাত করে বলেছিলেন : এই তো আমি বার্কলিকে খণ্ডন করলুম। আচার্য শঙ্কর বলেন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের দল গোগ্রাসে অন্নধ্বংস করতে করতে নির্লজ্জের মতো বলে—ও কিছু নয়, অন্নের ধারণামাত্র।

কিন্তু তাই বলে চণ্ডবিক্রমে চীৎকার করলে চলবে না যে, কাজই সব, চিন্তা জিনিষটা একান্তই আবর্জনা, নিছক সাংসারিক লাভলোকসান দিয়ে দার্শনিক মতবাদের নগদ মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে। সে কথার বিপদ দুদিকে। কাজের পিছনে সুচিন্তার সমর্থন না থাকলে নিছক কাজ অন্ধ উন্মাদনায় পর্যবসিত হবে। তাছাড়া, আকাশের মত মানুষের মন শুধু শূন্য থাকতে পারে না : কাজের উন্মাদনায় মন থেকে বিবেকবুদ্ধিকে বর্জন করলে মনের শূন্য দখল করে নেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুসংস্কার। তাই বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অত কটূক্তির পরও প্রাগ্‌ম্যাটিকদের মুখে বিজ্ঞানবাদেরই কথা! তাই কুসংস্কারের মোহিনী বাঁশি শুনিয়ে আত্মঘাতী যুদ্ধক্ষেত্রে দেশবাসীকে

ভুলিয়ে নিয়ে যাবার আগে ফ্যাসিবাদী পাণ্ডাকে গলাবাজি করতে হল : সংস্কৃতির নাম শুনলেই পিস্তলের জন্যে তাঁর হাত উসখুস করে। জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মানুষের মন থেকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে না পারলে তাদের কুসংস্কারের ক্রীতদাস করা যাবে কেমন করে ?

মার্কস্‌পন্থী তাই বলেন শুধু জ্ঞান নয়, শুধু কর্মও নয়, জ্ঞানকর্মের সার্থক সমুচ্চয়েই দর্শনের মুক্তি।

দর্শনে এই সরল সত্যের উপলব্ধি যে এতদিন হয় নি তার আসল কারণ অবশ্য সামাজিক। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দেখা দিয়েছে শ্রেণীবিভাগ : একদিকে অধম মজুরের দল, যারা শুধু গতর খাটায় আর শুধু গতর খাটায় বলেই মাথা খাটাবার অবসর পায় না। অপরদিকে ধনিক প্রভুদের শ্রেণী, গতর খাটাবার দরকার তাদের নেই, মাথা খাটাবার ঢালাও অবসর। এবং যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো তাই যেমন এই ধনিকশ্রেণীরই সম্পত্তি বলে স্বীকৃত তেমনি এই ধনিকশ্রেণীর যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাই পরম পুরুষার্থ বলে প্রচারিত— প্রচারিত হয়েছে গতর খাটানো নেহাতই ইতরের ধর্ম, চিন্তার মর্যাদা চরম মর্যাদা। শ্রেণীসমাজের চরম উৎকর্ষ ধনতন্ত্রে, ধনতন্ত্রের ছায়াশ্রয়েই তাই বিজ্ঞানবাদের অমন অখণ্ড প্রতিপত্তি। কিন্তু ধনতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে, তার ঐতিহাসিক ব্রতটুকু আজ উদ্‌যাপিত। পেশাদার প্রচারকের হাজার চীৎকারও তার নাভিশ্বাসের শব্দ ঢাকতে পারে না। দর্শনেও বিজ্ঞানবাদের পরমায়ু গতপ্রায় ; আভিজাত্যের মহাব্যোম থেকে দার্শনিক নেমে আসবে ধুলোর পৃথিবীতে, শেষ হবে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাধিকারপ্রমত্ত অহমিকা। যে নবীন নিঃশ্রেণিক সমাজ আজ আসন্ন সেখানে মাথা খাটানোর চেয়ে গতর খাটানোর সম্মান কম নয়।

সত্তা যদি বুদ্ধির মুখাপেক্ষী না হয় বরং বুদ্ধিই যদি হয় সত্তার

মুখাপেক্ষী তাহলে এই মূর্ত জড়জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে মানতে হবে। তবুও প্রচলিত যান্ত্রিক জড়বাদ নয়। যান্ত্রিক জড়বাদের প্রধান অসংগতি এই যে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদেই তার পরিসমাপ্তি। কড্‌-ওয়েলের অনুসরণে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ তোলা যায়: আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অচেতনভাবে যান্ত্রিক জড়বাদকে মেনে নিয়েছেন, জড় তাঁদের কাছে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, নিছক জড় হিসেবে তাকে বুঝতে পারাই যথেষ্ট। তাই মানসনির্ভর যা কিছু তা সম্পূর্ণ ভাবে বিশুদ্ধ জড় থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, সব কিছুই। জড় যেন বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র জড়মাত্র—পরিমাণ, ভর, দেশ, কাল ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুর ঠাঁই নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন এই তথাকথিত বিশুদ্ধ জড়ধর্ম-গুলির অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ স্বয়ংসত্য সত্তা নেই। অবশ্য আইনস্টাইন নিজে এক চরম বহিঃসত্তাকে আশ্রয় করেছিলেন, কিন্তু কোয়াণ্টাম-বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন এ জিনিষও আপেক্ষিক, দ্রষ্টানির্ভর। সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানে তাই বহিঃসত্তা বলে কিছুই বাকি রইল না। শুধুই গুটিকতক গাণিতিক সমিকরণ। এবং সে গুলি মানবচিন্তারই অঙ্গ! আধুনিক বিজ্ঞানে এই দুর্যোগের আসল কারণ তার গোড়ায় গলদ, সুরুতে বিশুদ্ধ জড়ের রাজত্ব থেকে চেতনমাত্রকে নির্বাসনের চেষ্টা। কিন্তু নির্বাসন দেওয়া মানেই তাদের জন্যে স্বতন্ত্র রাজত্ব গড়ে তোলা, বিশুদ্ধ চেতনার রাজত্ব। ফলে শেষ পর্যন্ত জড়বাদকে রক্ষা করা অসম্ভব। মার্কসপন্থী তাই বলেন জড়ের সত্তা প্রাথমিক হলেও চেতনাকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই, কেননা জড়ের ক্রমবিকাশের পথে চেতনা এসেছে এক অপূর্ব আবির্ভাবের মতো। জড়ের উপরই তার আবির্ভাব, তবু জড়ের সঙ্গে মেশামিশি—এমন কি জড়ের উপর তার প্রতিক্রিয়াও। কিন্তু তাই বলে সত্তার দিক থেকে

চেতনার বা চিন্তার দাবিই চরম দাবি নয়; বস্তুসত্তা ন্যায়শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়, বরং ন্যায়শাস্ত্রই বস্তুসত্তার মুখাপেক্ষী।

দর্শনে এই সরল সত্য এতদিন সচেতনভাবে স্বীকৃত হয় নি বলেই স্থিতি ও গতির সম্পর্ক নিয়ে এত বৃথা তর্ক। জেনো, শঙ্কর, স্পিনোজা প্রভৃতি চিন্তার দাবিকেই চরম দাবি বলে মেনেছিলেন। বিশুদ্ধ চিন্তার বিচারে বিরোধী ধারণার একত্র অবস্থিতি একেবারে অসম্ভব এবং গতির মধ্যে যেহেতু বিরোধী ধারণার আশ্রয় সেই হেতু গতিকে প্রতিভাসিক বলে তাঁরা উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু, মার্কস্‌পন্থী বলেন, মূর্ত দুনিয়া কেন ন্যায়শাস্ত্রের দাবি মানতে যাবে, বরং ন্যায়শাস্ত্রকেই মানতে হবে দুনিয়ার আইন। দুনিয়ায় যেহেতু গতি ও পরিবর্তন অবিসংবাদিত সত্য সেই হেতু শুধরে নিতে হবে ন্যায়শাস্ত্রকেই। এই সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন হেগেল, যদিও বিজ্ঞান-বাদের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন বলেই নিজের নব্যন্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি নিজেই ধরতে পারেন নি। ক্রোচেরও সেই অবস্থা: হেগেলের নব্যন্যায়কে আশ্রয় করতে গিয়ে হেগেলের মধ্যে যে কথা মৃত—বিজ্ঞানবাদের কথা—তাকেই তিনি প্রাণবান মনে করলেন। ফলে গতিকে সত্য বলে মানলেও সে গতি ক্রোচের কাছে নিছক চেতনা-রাজ্যের গতি। বের্গসঁর অবস্থা আরও চরম: এ গতি নিছক গতি,—যেন একটা হাউই আকাশে তারা ছিটিয়ে চলেছে! উপমা থেকে কেবল হাউই আর তারা আর আকাশকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কল্পনার এই মহাকাব্যকে সত্যের বর্ণনা বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হতে পারে, বের্গসঁ তাই সুরুতেই নির্বুদ্ধিতার গুণকীর্তন করেছেন।

মার্কস্‌পন্থী বলেন মূর্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখতে, সেখানে গতির কাল্পনিক রূপ নয়, বাস্তব রূপ। একেবারে ঘরোয়া উদাহরণ দেন

ধরা যাক চাষী একমুঠো বীজ ছড়িয়ে দিল ক্ষেতে। দুদিন পরে বীজগুলো আর বীজ নেই, ক্ষেতভরা সবুজ ধানের শিষ। আরও দুদিন পরে সেই সবুজ শিষও চোখে পড়বে না, চাষীর ঘরে গোলাভরা ধান। তাই বাস্তব গতিকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে যে পদ্ধতি পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অভাবের অভাব।' সবুজ ধানের শিষে একমুঠো বীজের অভাব, আবার গোলাভরা ধানের মধ্যে ক্ষেতভরা সবুজ শিষের অভাব। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিতে দেখা যায় এই 'অভাবের অভাবের' ফলে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব গুণের আবির্ভাব: এক মুঠো বীজ সহস্র ক্ষুধিতের ক্ষুন্নিবারণ করতে পারত না, গোলাভরা ধান তা পারে—গোলাভরা ধানের মধ্যে নতুন গুণের আবির্ভাব।

মার্কসপন্থী বলেন এই গতি ও পরিবর্তন শুধু জড়জগতের ধর্ম নয়, মানুষের সমাজব্যবস্থা, এমন কি তার শিল্প ও সংস্কৃতিও ইতিহাসেরই দাস, কেবল ভুললে চলবে না যে এই ইতিহাসের পিছনে প্রধান যে শক্তি তা জড় শক্তিই। এবং সেই জড়শক্তিকে বিশ্লেষণ করে মার্কসপন্থী দেখিয়েছেন তার প্রধান রূপ অর্থনৈতিক। ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপরই যুগে যুগে মানুষের সমাজ গড়েছে ভেঙেছে।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আজকের সমাজ এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে; তাই সংস্কৃতির প্রত্যেক বিভাগেও সংকট দেখা দিয়েছে—শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে। শ্রেণীসমাজের শৃঙ্খলে মানুষের অগ্রগতিকে বেঁধে রাখা আর চলবে না—এই দাবি নিয়ে পৃথিবী জোড়া জনগণের জাগরণ। তাই আজ দিকে দিকে এক দানবের হানা, সাম্যবাদের দানব। তাই বণিক পৃথিবীর প্রত্যেক প্রতিনিধি তার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ